সত্যের সন্ধানে: ৫৩

ইসলাম ও গণতন্ত্র ঃ দুটি জীবনাদর্শের সংঘাত

- এ বইটি তাদের জন্য যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে অনুধাবন করেন।
- বইটির শিরোনামে জীবনাদর্শের সংঘাত বলতে এখানে কেবলমাত্র আকীদগত এবং আদর্শগত সংঘাতকেই তুলে ধরা হয়েছে।
- বইটিতে গণতন্ত্র বলতে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।

মুহাম্মাদ আজিজুর রহমান খান

ইসলাম ও গণতন্ত্র
দুটি জীবনাদর্শের সংঘাত

মোঃ আজিজুর রহমান খান

খান প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৭৪০১৯২৪১১।

ইসলাম ও গণতন্ত্র
দুটি জীবনাদর্শের সংঘাত

মোঃ আজিজুর রহমান খান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০১২

খান প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার,
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

ISLAM & DEMOCRACY :
MD. AZIZUR RAHMAN KHAN
PAB: KHAN PROKASHONI
PRICE: 30.00 TK. 1 DOLAR (US).

গণতন্ত্রের উৎপত্তি

সপ্তম শতাব্দী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায় মুসলিমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকাল যেমন উচ্চ জ্ঞান লাভ করার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় যেতে হয়, চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপবাসীদেরকেও তেমনি আলহামরা, কর্ডোভা ও গ্রানাডায় জ্ঞানের তালাশে ভীড় জমাতে হতো। সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। পনের শতাব্দীতে ইউরোপে সবেমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত তারা অজ্ঞতার অন্ধকারেই ছিল।

সে সময় ইউরোপে খ্রিস্টান পাদ্রীদের শাসন ছিল। ইউরোপের পাদ্রী শাসকরা শোষণ ও নির্যাতন করার হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করতো। পাদ্রীরা ধর্মের নামে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে রাজত্ব করছিল। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দাবী করতো। তারা দাবী করত যে আল্লাহ তাদেরকে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা এবং তা তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। জীবনের প্রত্যেক দিকে প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে তারা নিজেদের মতামত জোর করে চাপিয়ে দিত। প্রভু যেভাবে তার চাকরকে শাসন করে সেভাবে তারা জনগণকে উৎপীড়ন করত।

পনের শতাব্দীতে ইউরোপে যখন নতুন জ্ঞান সাধনার উন্মেষ হয়, তখন পাদ্রীদের মনগড়া মতামত গবেষকদের নিকট ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল। এখান থেকে তাদের সাথে জনগণের সংঘাত শুরু হয়। পাদ্রীগণ তখন আর কোনো উপায় না পেয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলো। বেত্রাঘাত থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত বিভিন্ন অমানুষিক শাস্তি দ্বারা জনগণকে শায়েস্তা করতে লাগল। এ জুলুমের বিরুদ্ধে জনগণ ও চিন্তাশীলদের মধ্যে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠল। ধর্মের নামে পাদ্রীদের এ অধার্মিক আচরণ জনগনের মনে তীব্র ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টি করল।

বিদ্রোহীরা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্পূর্ণ বেপরোয়াভাবে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করল। তারা জীবনের সকল বিভাগ থেকে পাদ্রীদের উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হল। দীর্ঘ দু'শ বছর (ষোল ও সতর শতাব্দী) ধরে এই ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে। এ সংগ্রাম ইতিহাসে 'গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের' লড়াই নামে পরিচিত।

ইসলাম ও গণতন্ত্র দুটি জীবনাদর্শের সংঘাত ঃ

এ সংঘাতের সমাধানের জন্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা এগিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ ধর্মকে অস্বীকার করে বসল এবং কেউ কেউ ধর্মকে স্বীকার করলেও রাষ্ট্রের মাঝে ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করলো। এভাবে তারা সকলে ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করে ফেলার সিদ্ধান্তে একমত হলো। তাদের মতে, ধর্ম নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মকে অনধিকার প্রবেশ করতে দেয়া চলে না। তারা শাসন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করলো এবং মার্টিন লূথারের নেতৃত্বে একটি 'আপোষ রফা'য় উপনীত হলো।

এ আপোষের প্রস্তাবে বলা হল যে, "ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং মানুষের ধর্মীয় দিকের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাদ্রীদের হাতে থাকবে। আর জনগণকে শাসন করার কর্তৃত্ব থাকবে জনগণের হাতে। তাদের উপর আর কারো কর্তৃত্ব থাকবে না। তারাই আইন প্রণয়ন করবেন, এ আইন দ্বারাই তারা শাসিত হবেন। তারা যে বিধান রচনা করবেন তা দ্বারা পরিচালনার জন্য নিজেরাই নিজেদের শাসক নিযুক্ত করবেন। সমাজের পার্থিব জীবনের সকল দিকের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং পার্থিব কোন বিষয়েই পাদ্রীদের কোন প্রাধান্য থাকবে না। অবশ্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে পাদ্রীদের নিকটই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবার শপথ গ্রহণ করতে হবে।"

এভাবে জনগণকে পাদ্রীদের শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য মানব রচিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। এটি মানব রচিত শাসন ব্যবস্থা। পশ্চিমা সভ্যতার এ বিশ্বাসের ফলে ধর্ম জীবন এবং রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে ফেলা হলো। ধর্ম সঠিক না সঠিক নয় তা তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল না। বরং তারা ধর্মকে সমস্যা মনে করে তাদের জীবন থেকে তা সরিয়ে দিয়েছে। এখান থেকেই ধর্ম নিরপেক্ষতার (Secularism) উৎপত্তি হয়।

◎ আজকে যারা সেক্যুলারিজমের (Secularism) কথা বলেন তাদের মনে রাখা উচিত ধর্মনিরপেক্ষতা এসেছে খৃষ্টান ধর্মের পাদ্রীদের সাথে জনগণের সৃষ্ট সমস্যা থেকে, ইসলামের কোন সমস্যা থেকে আসেনি। তার পরেও তা জোর করে মুসলমানদের উপর চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

◎ এটি একটি আপোষরফামূলক বিশ্বাস। 'আল্লাহর বিধি-বিধান দ্বারা জীবন চলবে কি চলবে না' এ বিষয়ে তারা আপোষ করে ফেলল। এ আপোষরফামূলক সমাধানের ফলে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়াবলী থেকে

ধর্ম আলাদা হয়ে পড়ল। ফলে ধর্ম রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা থেকেও আলাদা হয়ে পড়ল। ‘ধর্ম রাষ্ট্র থেকে আলাদা’ এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল।
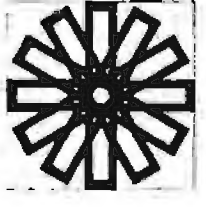
এখানে উল্লেখ্য খ্রিস্টান পাদ্রীরা ধর্মের নামে অন্যায় আচরণ ও মনগড়া নীতি প্রচার করতো। তাই প্রকৃতপক্ষে জণগনের এ সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না, তা ছিল পাদ্রীদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাদ্রীদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তারা জীবন থেকে ধর্মকে পরিত্যাগ করে বসল। ‘মাথা ব্যথা’ সারানোর জন্য ‘মাথা কেটে ফেলা’র প্রেসক্রিপশন দেয়ার মতো।

এ গণতান্ত্রিক মতবাদ সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না বটে, তবে তাদের মতে, দুনিয়ার জীবনে উন্নতি, শান্তি ও প্রগতির জন্য আল্লাহ বা রাসূলের কোন প্রয়োজন নেই। তারা ব্যক্তি জীবনে ঐচ্ছিকভাবে ধর্মীয় বিধান মেনে চলা এবং সমাজ জীবনে আল্লাহকে অস্বীকার করার সুবিধাবাদী মতবাদ তৈরি করে নিল। ফলে মানব জাতির জন্য আল্লাহকে বিধানদাতা হিসাবে অস্বীকার করা হলো।

এ বিশ্বের সকল কিছু যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন, তাহলে ‘সেই মহাশক্তিশালী স্রষ্টার বিধানকে বাস্তব জীবনে গ্রহণ করা যাবে না’ -এটা আল্লাহর সাথে কুফরী করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহকে যদি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মান্য করা না-ই যায়, তাহলে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ইবাদত করা অর্থহীন হয়ে পরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকা অনেক মুসলমানই পশ্চিমা প্রভুদের নিকট নৈতিক ও মানসিক আত্মা বিক্রয় করে বিশ্বস্ত গোলামের মতো তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছে।
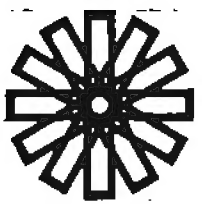
গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার আকীদা বা বিশ্বাস হলো ধর্ম ব্যক্তি জীবনে এবং ইবাদত খানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষের নিজস্ব মতামত দিয়ে পরিচালিত হবে। পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আকীদা হলো মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। জীবন এবং রাষ্ট্র সকল কিছু সে ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হবে। আল্লাহর হুকুম কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায় :

গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসন ব্যবস্থা, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা অর্থে বুঝানো হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা তৈরি করে এবং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে আইন রচনা করে। এভাবে জনগণ নিজেদের ক্ষমতার অনুশীলন করে এবং নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন এবং শাসক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির একই রকম অধিকার রয়েছে। তবে সকল মানুষ এক জায়গায় সমবেত হয়ে আইন প্রণয়ন করা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এ প্রতিনিধিরা পার্লামেন্ট গঠন করে। তারা জনগণের ইচ্ছার বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার গঠন করে। এভাবে এটি সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায় এবং তাদের কর্তৃক নির্বাচিত শাসকদের মাধ্যমে তাদের প্রণীত ব্যবস্থা ও আইন বাস্তবায়ন করে। অর্থাৎ জনগণ নিজেরা নিজেদের শাসন করে, ব্যবস্থা প্রণয়ন করে এবং আইন রচনা করে, যে আইন দ্বারা তারা নিজেদের শাসন করে।
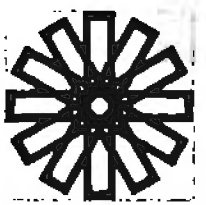
জনগণই এ ব্যবস্থায় বিধান প্রণয়ন করে এবং তারা নিজেদের তৈরি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কারো কাছে জবাবদিহী করে না। জনগণই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা ধারণ করে এবং জনগণই তাদের সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে। তাই জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভু।

গণতন্ত্রের বিশ্বাস হচ্ছে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে ফেলা। জীবন থেকে ধর্ম আলাদা করার ফলে মূলত: আইন ব্যবস্থা এবং কর্তৃত্ব থেকে ধর্ম বহিস্কৃত হয়ে পরে এবং জীবন ব্যবস্থা নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, শাসক নির্বাচন, শাসকের ক্ষমতা নিধারণ, জনগণের এখতিয়ারাধীন হয়ে পরে। এ বিশ্বাস ধর্মকে অস্বীকার করে নি, কিন্তু জীবন এবং রাষ্ট্রে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করেছে।
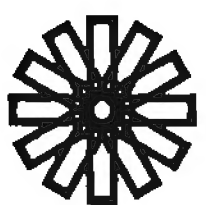
জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি। এ বিশ্বাস থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

ইসলাম এ বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী আকীদার ভিত্তি হচ্ছে জীবন সমাজ রাষ্ট্র এর সকল বিষয় আল্লাহ তায়ালার আদেশ এবং নিষেধ অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালা যে ব্যবস্থা দিয়েছেন সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক। গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত ব্যবস্থা। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নয় এবং এর সাথে ইসলামের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হতে বাধ্য। শাসক সম্প্রদায় আল্লাহর দাসত্ব ও ধর্মের বন্ধন থেকে যদি মুক্ত হয়, রাস্ট্র যদি আল্লাহর নিকট জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত হয় এবং আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি যদি অবিশ্বাসী হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলবে। তারা নিজেদের পার্থিব লাভ লোকসানের ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গদি রক্ষার জন্য তারা যে কোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত হবে। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য তারা শাসনযন্ত্রকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা আজ সে চেহারাই দেখতে পাচ্ছি।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা হয়। তাই এটি অস্বীকারকারীদর ব্যবস্থা বা কুফরী ব্যবস্থা।

মুসলমানরা ইসলামের সাথে বিরোধপূর্ণ এবং অস্বীকারকারীদর ব্যবস্থা বা কুফরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না, বরং দৃঢ়ভাবে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এসকল কিছুকে বর্জন করার কঠিন নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন,

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ

অর্থ: "তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়, অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণ রুপে অস্বীকার ও অমান্য করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে।" (সূরা আন নিসা ৪, আয়াত ৬০)

যে আকীদা থেকে এ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যে ভিত্তির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত, যে চিন্তা এবং ধারণার জন্ম দেয় তা মুসলিমদের আকিদা বা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

গনতন্ত্রের আকিদা থেকে নিম্নোক্ত বিষয় দু'টির উদ্ভব হয়।

১। সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্য।
২। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।
উপরোক্ত দু'টি ধারনার উপর ভিত্তি করেই ইউরোপের দার্শনিক এবং চিন্তাবিদগণ তাদের ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এর দ্বারা পাদ্রীদের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে এবং সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব জনগণকে দেয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থায় তারা যেমন ইচ্ছে মতামত প্রকাশ করতে পারে, বাস্তবায়ন করতে পারে এবং অনুশীলন করতে পারে। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌমত্ব ভোগ করে।
তারা প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে। এভাবে তারা সংবিধান প্রণয়ন করা কিংবা সংবিধান সংশোধন বা বাতিল করতে পারবে। তারা নিজেরা আইন প্রণয়ন করতে পারে, বাস্তবায়ন করতে পারে, তারা যাকে ইচ্ছে শাসক নির্বাচন করতে পারে এবং যেভাবে ইচ্ছে বিচার-ফয়সালা করতে পারে। তাদের কর্তৃত্ব থেকে শাসক নির্বাচন করতে পারে। ফলে জণগনই সকল ক্ষমতার উৎস।
পোপ এবং সম্রাটদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফসল হিসেবে ধর্মীয় আইন কানুনের অবসান করা হলো। ফলে 'সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্য' ও 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ দু'টি ধারণার বাস্তবায়ন করা হলো। ফলে জনগণ হয়ে দাঁড়ালো সার্বভৌত্বের প্রতীক এবং সকল ক্ষমতার উৎস।

পক্ষান্তরে ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার। যারা মুসলমান থাকতে চায় তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যবস্থা আন্তরিকতার সাথে এবং পুরোপুরিভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ফরজ বা বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন-

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

অর্থ: "ইসলামই আমার কাছে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে দিলাম।" (মায়েদা, আয়াত ৩)

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

অর্থ: "যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থের শামীল।" (আল ইমরান, আয়াত ৮৫)

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ফরজ করেছেন। এভাবে ইসলামকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ব্যবস্থা ও মতবাদকে মুসলিমদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করার পর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের মধ্যকার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘোষণা করছেন,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

অর্থ: "সুতরাং আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন, আল্লাহ যা নাযিল করেছে তদানুসারে এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।" (সূরা মায়িদাহ ৫, আয়াত ৪৮)

গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কিছু শাখাগত বিষয় এক রকম বলে বাহ্যিকভাবে মনে হলেও, বাস্তবে এই দু'টি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আকাশ-পাতাল। একটি মেনে নিলে অপরটি আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। কোনো অবস্থাতেই উভয়টির সংমিশ্রণ হতে পারে না। হয়তো ইসলাম, অথবা গণতন্ত্র। মুসলিমদের জন্য ইসলাম ছাড়া, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে খিলাফত ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

গরিষ্ঠতা সিদ্ধান্তের মানদন্ড কি না :

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যা গরিষ্ঠতাই হচ্ছে সিদ্ধান্তের মানদন্ড। এ ব্যবস্থায় সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতকেই সকল জনগণের মতামত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ জন্য আইন প্রণেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য যিনি বেশি ভোট পান তিনিই নির্বাচিত হন। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আইন প্রণয়ন করা, কোন প্রতিনিধি নির্বাচন করা, সরকারের অবস্থা যাচাই করার জন্য যার পক্ষে বেশী ভোট পওে, সেটি সঠিক বলে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে জ্ঞানীলোকের মতামত কিংবা অশিক্ষিত লোকের মতামত একই পাল্লায় মূল্যায়ন করা হয়।

এমন কি আল্লাহ তায়ালা যা নিষিদ্ধ করেছেন, এরকম কোন বিষয়ের পক্ষেও যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন তাহলে তা বৈধ (হালাল) বলে বিবেচিত হবে। যেমন ইউরোপের পার্লামেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে 'পূরুষে পূরুষে বিবাহ'কে বৈধতা দিয়েছে।
পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে যদি দুনিয়ার সকল মানুষও একত্র হয়ে কোন হারাম কাজের পক্ষে মতামত প্রদান করে তবে ইসলামে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন সকল মানুষ যদি সূদের পক্ষে মতামত প্রদান করে, সমাজে যাতে জেনার বিস্তার না ঘটে সেজন্য কোন বিশেষ স্থানে জেনা করার ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে মতামত প্রদান করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকানার অধিকার বাতিল করার দাবী করে, বিশ্বাসের বা ঈমানের স্বাধীনতা দাবী করে -তা সম্ভব নয়। সকল উম্মাহ একত্রে ইসলাম পরিপন্থী সামান্যতম কোন দাবী করলেও তার কোন মূল্য নই।
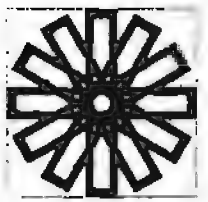
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্তের মানদন্ড হচ্ছে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মানদন্ড হচ্ছে কাজটি হালাল কিংবা হারাম। দুনিয়ার সকল মানুষ একদিকে ভোট দিলেও কোন হারামকে হালাল বা কোন হালকে হারাম করা যাবে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে এটি অনায়াসেই করা যায়।

গণতন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতা :

পশ্চিমা রাষ্ট্র ব্যবস্থা যখন ধর্ম থেকে তাদের জীবনকে আলাদা করে ফেলল, তখন সে তার নিজের সিদ্ধান্তকে আল্লাহর হুকুমের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। তখন তাদের সিদ্ধান্তের মূল চালিকা শক্তি হয়ে গেল লাভ-লোকসান বা Benifit। তারা ভাল-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ কোন কিছু করা বা না করা, সকল কিছু নির্ধারণ করতে লাগলো লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে। এভাবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে নিম্নোক্ত চারটি মানদন্ড নির্ধারণ করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

(ক) বিশ্বাসের স্বাধীনতা।

(খ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

(গ) অবাধ ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা।

(ঘ) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

বিশ্বাসের স্বাধীনতা :

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে বিশ্বাসের (Belief) স্বাধীনতা প্রদান করা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থার আওতায় কোন মানুষ যে কোন কিছুকে আকীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। যে কোন কিছুর উপর ঈমান আনতে পারে কিংবা যে কোন কিছু বিশ্বাস করতে পারে। আবার চাইলে পরক্ষণেই তার উপর থেকে ঈমান বা বিশ্বাস প্রত্যাহারও করতে পারে। একজন মানূষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছে করলে নাও করতে পারে। কিংবা একই সাথে একজন মানুষ নামায পড়তে পারে, আবার মূর্তি পূজাও করতে পারে।

এ হচ্ছে তার বিশ্বাসের স্বাধীনতার ব্যাপার। আজকাল গণতন্ত্র চর্চার ফলে আমাদের সমাজে এর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন আজকাল অনেক মুসলমান যুবকেরা ক্বদরের রাত্রিতে রাত জেগে ইবাদত করে, আবার পহেলা বৈশাখে মঙ্গল প্রদীপের নামে অগ্নিপূজাও করে। একইভাবে তারা যেমন ঈদের নামাযে দলবেঁধে শামিল হয়, তেমনি দূর্গা পূজাকে সার্বজনীন বলে তাতেও অংশ গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হয় না।

আর এই অবস্থার সুস্পষ্ট নির্দেশনাও এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান নেতৃবৃন্দের কাছ থেকেই আসছে। তাই তো আমরা আমাদের এক মহান (!) নেত্রীর মুখ থেকে দূর্গা পূজার অনুষ্ঠানে গিয়ে দূর্গা মূর্তীর প্রতি আকিদা পোষণ করে বলতে শুনেছিলাম "এবার গজে চড়ে মা দূর্গা আসায় ফসল ভাল হয়েছে"। সে তার আকিদা বা বিশ্বাসের জায়গায় আল্লাহর সাথে দূর্গাকেও স্থান দিয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)। এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটিই স্বাভাবিক।

কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় একজন মুসলিমের আকীদার স্থলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর স্থান দিলে তা হবে সুস্পষ্ট শিরক করল এবং সে মুশরিক হিসেবে পরিগণিত হবে। আবার গণতন্ত্রে একজন মানুষ যেমন ইচ্ছে আকীদা গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যবস্থায় একজন মানুষ নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী কখনো মুসলমান, কখনো হিন্দু কিংবা কখনো খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারে আবার কোনো বিশ্বাস না রেখে নাস্তিকও হতে পারে। গণতন্ত্র তাকে এ অধিকার প্রদান করে। একজন লোক যে কোন সময় যে কোন ধর্মমত পরিবর্তন করতে পারে। এ জন্য সে গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার কাছে কখনো দায়ী হবে না। সমাজের দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বিষয়গুলো সহজেই দৃশ্যমান হবে।

যেমন এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়, আমাদের দেশের দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ এক নেতা বিগত ১৩ জুলাই-২০১১ এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে, "আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই।"
সে গণতন্ত্রকে তার জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে বলেই তার আকীদার স্বাধীনতা থেকে এ কথাগুলো বেড়িয়ে এসেছে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় যে কেউ তার আকীদা বা বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারে। যেমন যে কেউ যে কোন সময় যতবার ইচ্ছে তার ধর্মমত পরিবর্তন করতে পারে। কোন ধর্ম বর্জন করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারে কিংবা আদৌ কোন ধর্মে বিশ্বাস নাও রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সে পুরোপুরিই স্বাধীন।

কিন্তু ইসলাম তার অনুসারী কোনো মুসলিমকে নিজ আকীদা বা বিশ্বাস অর্থাৎ স্বীয় দীন ইসলাম পরিবর্তন করার অধিকার প্রদান করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষ ইচ্ছা করলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাস রাখতে পারে। তাকে জোর করে মুসলিম বানানোর কোনো সুযোগ নেই। তবে কেউ যদি অমুসলিম থেকে মুসলিম হতে চায় তবে তাকে জেনে বুঝে মুসলিম হতে হবে। কেননা কোন মানুষ একবার বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করলে সে এরপর আর তার আকীদা বা বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারবে না। অর্থাৎ কোন মুসলমান ইসলাম বাদ দিয়ে কিংবা একই সাথে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম কিংবা গণতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না। কেউ তার আকীদা বা বিশ্বাস পরিবর্তন করলে ইসলামিক ব্যবস্থা অনুসারে তাকে তওবা করে ফিরে আসার আহবান জানানো হবে। সে তওবা করে ফিরে এলে মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করবে। আর যদি সে ফিরে না আসে তাহলে তাকে মুরতাদ ঘোষণা করা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। তাই গণতন্ত্রের বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইসলামের মৌলিক আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক।
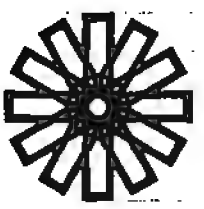
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় একজন মানুষ হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদী, মুশরিক বা কাফির যে কোন আকীদা গ্রহণ করতে পারে এবং সেভাবে জীবন জাপন করতে পারে। কিন্তু ইসলামের আওতায় একজন মানুষকে অবশ্যই মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামী ব্যবস্থা দ্বারা জীবন যাপন করতে হবে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা :

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর একটি ভিত্তি। এ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি যে সকল চিন্তা চেতনা ধারণ করে, তা সে প্রকাশ করার অধিকার রাখে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যেকোন মতামত বা চিন্তা বহন করতে পারে, এ মতামত সে প্রকাশ করতে পারে এবং এ মতামতের দিকে কাউকে আহবান করতে পারে। এ ব্যাপারে সে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং এ ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তার মতামত প্রকাশ করার জন্য যে কোন উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে পারে। যেমন বক্তৃতা, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট ইত্যাদি যে কোন উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে পারে। গণতন্ত্রে এ ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার অধিকার নেই। যতক্ষন পর্যন্ত না সে অন্য কারো স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করে। এভাবে কোন ব্যক্তি যে মতামত লালন করে তা সে প্রকাশ করতে পারে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রায়শই অন্য মতামত বা ব্যক্তিকে আক্রমণ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গণতন্ত্রীরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে নানা অপকর্ম করে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভারতীয় বংশদ্ভুত সালমান রুশদী Satanic Verses লিখে ইসলামকে আক্রমণ করেছিল এবং এটাকে তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে চালিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমা মিডিয়াগুলোও জিগির তুলেছিল যে, সে তার মতামত প্রকাশের অধিকার রাখে। একইভাবে ডেনমার্কের কার্টুনিস্ট এবং আমাদের দেশের প্রথম আলো পত্রিকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করে এটাকে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে প্রচার চালিয়েছিল। এভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আসলে ভিন্নমত বা পথকে আক্রমণ করার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে।

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামী শরিয়া অনুমোদন করে না এমন কোন মতামত বা বক্তব্য মুসলমানরা প্রদান করতে পারবে না। মুসলমানদের সকল মতামত শরিয়ার আলোকে হতে হবে। মুসলমান শরিয়ার দলিলের ভিত্তিতে কোন অভিমত ধারণ করা, মতামত ব্যক্ত করা এবং কোন মতামতের দিকে আহবান করতে পারে। পক্ষান্তরে শরিয়াহ অনুমোদন করে না এমন কোনো মতামত ধারণ করা, পোষণ করা এবং তার প্রতি আহবান করার কোন সুযোগ

ইসলাম কোনো মুসলিমকে দেয়নি। যদি কেউ এই সীমা লংঘন করে তাহলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ইসলামের সাথে সংঘাতপূর্ণ এবং তা কোন মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না।
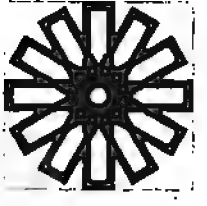
মুসলমানদের মতামত ধারণ করা, বলা এবং আহবান করা শরিয়াহ আইনসিদ্ধ হতে হবে। তারা নিজের ইচ্ছানুযায়ী বা মনগড়া কোন মতামত ধারণ করতে বা প্রচার করতে পারবেন না।

অবাধ ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা :

মালিকানার স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর একটি স্তম্ভ। গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে, কোন মানুষ যে কোন পরিমাণ, যে কোন সম্পদের মালিক হতে পারে। নদ-নদী, পাহাড় পর্বত, খনিজ সম্পদ, আলো-বাতাস সকল কিছুর মালিকানা মানুষ অর্জন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে এ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

ফলে পশ্চিমা বিশ্ব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনগণের সম্পদ দখল করার জন্য হায়েনার মতো হামলে পরছে। এ সকল পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোই কৌশলে কলোনী তৈরি করে অন্য রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠন করা, তাদের শিল্পপণ্যের বাজার দখল করাসহ তাদের জনসাধারণকে দারিদ্রতা ও দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। পশ্চিমাদের পোষাক তৈরি করার জন্য আমাদের মেয়েদের দিয়ে রাত দিন পরিশ্রম করানো হচ্ছে। এখানে মূলতঃ তাদের জীবন-যাত্রার উন্নয়ন কিংবা মানবিক মূল্যবোধ কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। সমাজের মধ্যে ব্যাপক শ্রেণী বৈষম্য তৈরি করা হচ্ছে। সম্পদের মালিকনা অর্জন করার ক্ষেত্রে তাদের মানবিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। পশ্চিমা রাষ্টগুলোকে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আক্রমণ করতে দেখি কেবলমাত্র সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য। এক দিকে সম্পদের প্রাচুর্য, অন্যদিকে কোন মানুষ না খেয়ে মারা গেলেও তার কোন দায়বদ্ধতা নেই। পূঁজিবাদের গুদামে যখন লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য নস্ট হয়ে যাচ্ছে কিংবা পোকায় খাচ্ছে, তখন আফ্রিকাতে মানুষ নামের কঙ্কালসার দেহগুলো না খেয়ে শুকিয়ে মারা যাচ্ছে। এতে কারো কোন দায়বদ্ধতা তৈরি হয় না। কারণ এ ব্যবস্থা মনে করে সম্পদ তার নিজের এবং সে নিজেই তা উপার্জন করেছে।

ইসলামী ব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিকানাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একই সাথে ইসলাম কে কোন জাতীয় সম্পদের মালিক হতে পারবে তার শ্রেণী বিভাগও করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি কখনো প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হতে পারবে না। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সকল জনগণের সমান অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হলে তাতে অন্যের অধিকার ব্যহত হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি কোন নদীর মালিকানা অর্জন করে অন্যদের নিকট থেকে টোল আদায় করতে পারে। যেমন খনিজ সম্পদ, এটি জনগণের সম্পদ, কোন ব্যক্তি বা কোম্পানি এর মালিক হতে পারবে না। কিন্তু গণতন্ত্রে এটি অহরহ হচ্ছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ ও তার মালিকানার ধারণাটি নিম্নরূপ :

ক্রম	সম্পদ	যেমন	মালিক বা তত্ত্বাবধায়ক
১	ব্যক্তিগত সম্পদ	মৌলিক প্রয়োজনীয় বাড়ী, গাড়ী, জমি-জমা ও আনুসাঙ্গিক সম্পদ ইত্যাদি...	ব্যক্তি
২	জনগণের সম্পদ	প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি...	সকল জনগণ
৩	রাষ্ট্রীয় সম্পদ	গণিমতের এক পঞ্চমাংশ, রাষ্ট্রীয় ভূমি, রাষ্ট্রীয় ইমারত ইত্যাদি...	রাষ্ট্র

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু অবাধ ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা আছে এবং এর মূল বিশ্বাসই যেহেতু যে কোনো উপায়ে অধিক পরিমাণ বেনিফিট তাই এই ব্যবস্থায় কেউ ইচ্ছে করলে প্রচুর পরিমাণ পণ্য মজুত করে জিনিস পণ্যের দাম বাড়িয়েও ব্যবসা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাছে সে কোন অপরাধী নয়। কিন্তু ইসলাম জনগণের ভোগান্তি হতে পারে এরকম সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। কেউ এরকম কোন কাজ করলে রাষ্ট্র তাকে প্রতিহত করবে। ইসলামিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং সকল কাজের মানদন্ড হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং হালাল ও হারাম। পশ্চিমা সভ্যতা অনুযায়ী সম্পদ অর্জন করা হয় সর্বোচ্চ মাত্রায় ইন্দ্রিয়গত পরিতৃপ্তি বা ভোগের জন্য। আর ইসলামী সভ্যতায় সম্পদ অর্জন ও সম্পদ ব্যয় করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য।
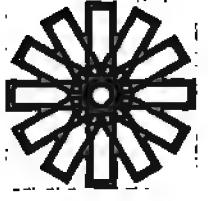
পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবাধ সম্পদের মালিকানার আড়ালে রয়েছে তার বিশ্বাসের সেই মূল চিন্তা 'মুনাফা'। তাদের সকল কাজে ক্রাইটেরিয়া হিসেবে মুনাফাকে চিন্তা করা হয়। ইসলামে সম্পদের মালিকানা তাদের আকীদার সাথে সম্পর্কিত। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য এটা পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, তাদের কঠিনভাবে এটি জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা দুনিয়ার জীবনে কিভাবে সম্পদ উপার্জন করেছিলো এবং কিভাবে তা ব্যয় করেছে। এটি ইসলাম কারো খামখেয়ালীর উপর ছেড়ে দেয়নি।

ব্যক্তি স্বাধীনতা :

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা কোন ব্যক্তিকে সকল প্রকার বিধি-নিষেধ থেকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে। এ স্বাধীনতা কোন ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবীয় মূল্যবোধ থেকেও স্বাধীনতা প্রদান করে। এ স্বাধীনতার কোন সীমা নেই। এ স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে কোন মানুষ অন্যের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে কিংবা অন্যের কোন ক্ষতি না করে যে কোন কাজ করতে পারবে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি হচ্ছে মূখ্য। ব্যক্তির আশা আকাঙ্খা, চাহিদা পূরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। ব্যক্তির প্রত্যাশা পূরণকে রাষ্ট্র আইনগত বৈধতা প্রদান করে। এ স্বাধীনতার ফলে যে যেভাবে ইচ্ছে জীবনের চাহিদা মেটাতে পছন্দ করে, সেভাবে তা উপভোগ করবে এবং সেখান থেকে কেউ তাকে বাঁধা দিতে পারবে না।
অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজে যে অধঃপতিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবারে তার গুটি কয়েক নমুনা তুলে ধরা যাক।

পরিবার প্রথায় ভাঙ্গন :

অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজের পরিবার প্রথা ভেঙ্গে পরেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি একক স্বাধীন সত্তায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আলাদা এবং অন্যের সাথে বন্ধনহীন। প্রতেক্যে জীবনের চাহিদা, আরাম আয়েশ ও জীবনকে অতিমাত্রায় উপভোগ করা একান্তই নিজের মতো করে পেতে চায়। ফলে ব্যক্তি পরিবারের বন্ধন অনায়াসেই উপড়ে ফেলে দেয়। ছেলে-মেয়েরা মা-বাবাদের ফেলে নিজেদের মতো জীবন-যাপন শুরু করে। তারা তাদের মা-বাবা, পিতা-পুত্র, ভাই-বোনের

মধ্যে সহজাত ভালবাসা ও সহানুভুতি হারিয়ে ফেলেছে। শতশত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রাস্তা ঘাটে পার্কে ঘুরে বেড়ায়, তাদেরকে সঙ্গ দেয়ার কেউ নেই। অনেকে বাধ্য হয়ে কুকুরকে সাথী হিসেবে বেছে নিয়েছে। তারা কুকুর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কুকুরের সাথে খায়, ঘুমায় এবং বসবাস করে। পরিবারহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জন্য কুকুরই একমাত্র বিশ্বস্থ বন্ধু। বৃদ্ধ বয়সে এসকল মা-বাবারা ওল্ড হোমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে।

পক্ষান্তরে ইসলামে মা-বাবা এবং সন্তান-সন্ততির পারস্পরিক অধিকার সবিস্তারে প্রদান করে তা বাস্তবায়ন করেছে। ঘোষণা করা হয়েছে 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত' এবং ইসলাম মা-বাবার সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। ফলে প্রকৃত মুসলিদের বৃদ্ধ বয়সে ওল্ড হোমে যেতে হয় না। সন্তান তাদেরকে আদর যত্ন দিয়ে আগলে রাখে।
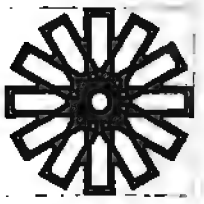
বৃদ্ধ বয়সে পারিবারিক বন্ধনহীন ওল্ডহোম কোন সমাধান নয় বরং ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত থাকলে সন্তান ও পিতা-মাতা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দায়িত্ববোধই উভয়কে আগলে রাখে এবং নিরাপত্তা বিধান করে।

অবাধ যৌনাচারের বিস্তার :

ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজে অবাধ যৌনাচারের বিস্তার লাভ করেছে। কিশোর-কিশোরীরা যথেচ্ছ যৌনাচারে লিপ্ত হলেও এমনকি মা বাবার কিছু করার থাকে না। কারণ এ অধিকারটি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আওতায় পরে। পশ্চিমা দেশের রাস্তা-ঘাটে, পার্কে, বাসে, অনুষ্ঠানে এমনকি কোন স্কুলে নারী-পুরুষেরা জড়াজড়ি, আলিঙ্গন, চুমো খাওয়া মহড়া কারো দৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। তারা নগ্ন হয়ে চলাফেরা করতে পারে, মাতাল হতে পারে। অনেক নারী-পুরুষ একত্রে একই সময় একই স্থানে যৌনাচারে লিপ্ত হয়। যা বনের জীব-জানোয়ারকেও হার মানায়। অস্ট্রেলিয়াতে এক বাবা তার মেয়েকে সতর বছর আটকে রেখে যেনা করেছে। যা অনেকেই পত্রিকায় দেখে থাকবেন। আমেরিকার একটি সমীক্ষা পেপার বের হয়েছিল তাতে জঘন্য তথ্য পাওয়া গেছে। অনেকেই বলেছে যে তারা আত্মীয় স্বজন মা, বাবা ও বোনের সাথে যৌনাচার করে থাকে।

পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যবস্থায় মানুষ কিভাবে তাদের যৌন চাহিদা মেটাবে ইসলাম তার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ চাহিদাকে ইসলাম একবারে অবদমিত করেনি কিংবা অবাধ করে ছেড়েও দেয়নি। নারী-পুরুষের

মিলনের ক্ষেত্রে ইসলাম সুশৃঙ্খল বিবাহ ব্যবস্থা প্রদান করেছে। বিবাহ বহির্ভূতভাবে কোন নারী বা পুরুষ অন্যের সাথে মিলিত হতে পারবে না। এ শৃঙ্খলা রক্ষায় ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান আরোপ করেছে।

রাস্ট্রীয় জারজ সন্তান :

পাশ্চাত্যে অবাধ যৌনাচার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে ছেলে মেয়েরা যে যেভাবে ইচ্ছে চাহিদা মেটায়। যখন যার সাথে ইচ্ছে মিলিত হচ্ছে। তারা বিবাহ বহির্ভূতভাবে লীভ টুগেদার করে। এ যৌনাচারের ফলে যে জারজ জন্ম হচ্ছে, এর জন্মদাতা মাতা বা পিতা সে জারজ সন্তানের দায়িত্ব নিতে নারাজ। ফলে জারজদের দায়িত্ব নেয়ার জন্য রাষ্ট্রকে এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে যে সন্তানের জন্ম হয় তার দায়-দায়িত্ব কে কতটা এবং কিভাবে বহন করবে, তা ইসলাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পিতা সন্তানের কতটুকু দায়িত্ব পালন করবে কিংবা মাতা কতটুকু দায়িত্ব পালন করবে তা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব পরিবারের উপর বর্তায়। এ জন্য রাষ্ট্রীয় এতিমখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। কিংবা মানব সন্তানকে পিতা-মাতার আদরবিহীন মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে অনাহুতভাবে বেড়ে উঠতে হয় না।

পুরুষে পুরুষে কিংবা মেয়েতে মেয়েতে যৌনাচার :

গণতন্ত্রের অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে তারা যেভাবে ইচ্ছা যৌনচার করতে পারে, যেমন পুরুষে পুরুষে কিংবা মেয়েতে মেয়েতে যৌনাচার করে থাকে। এটা তাদের কাছে একটি মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্রের ব্যক্তি স্বাধীনতা এ অধিকার সংরক্ষণ করে। পশ্চিমা দেশগুলোর অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে আজ মেয়েতে মেয়েতে এবং ছেলেতে ছেলেতে জঘন্য পাপাচার করার আইনগত অধিকার এ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ভাষায় অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। ফলে পশ্চিমা রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট আজ তাদের বিকৃত চাহিদা মেটানোর জন্য পুরুষে-পুরুষে কিংবা মেয়েতে-মেয়েতে বিবাহকে বৈধতা দিয়েছে। মানুষকে বিপথগামী করার এ জঘন্য পন্থা রাষ্ট্র আইন করে বৈধতা প্রদান করেছে। এটি গণতান্ত্রিক দেশের স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম এ রকম গর্হিত কাজকে ঘৃনা করে। আল্লাহ্ তায়ালা আদ ও সামুদ জাতীকে এ রকম গর্হিত কাজের জন্য ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কুরআনে এর শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন-

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

অর্থ: "এবং আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব, দেখ গোনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে।" (সূরা আরাফ, আয়াত ৮৪)

পশুর সাথে যৌনাচার :

সমকামিতার পাশাপাশি পশ্চিমা সমাজ জীব-জন্তুর সাথে যৌনাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। তারা আজ নারী-পুরুষে কিংবা পুরুষে-পুরুষে কিংবা নারীতে-নারীতে ও তৃপ্তি পায় না। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজ আজ পশুর সমাজে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পশ্চিমা বিশ্বকে আজ এমন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে যে একটি পশু যেভাবে তার জৈবিক চাহিদা মেটায় তার চেয়েও জঘন্য পর্যায়ে মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে। তারা ঘৃন্য প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়েছে। তাদের বিকৃত চাহিদা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের ফলে তারা পশুর চেয়েও নীচে নেমে গেছে। এখন তারা কুকুর-বেড়ালের সাথেও জেনা করে। আগামীতে তাদের এ গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়ে রাষ্ট্র হয়তো আইন করে কুকুর-বেড়ালের সাথে বিবাহ করাকেও বৈধতা দিয়ে দিবে। কারণ তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতে তারা যে কোন আইন পাশ করার অধিকার রাখে।

জীব-জন্তুর সাথে যৌনাচার আজ পশ্চিমা বিশ্বে এইডস বিস্তারের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সকল প্রকার অনৈতিক কর্মকান্ড সাধন করে তাতে বৈধতায় প্রলেপ দেয়া হয়েছে।

তাদের এ কদাকার কুৎসিত সমাজ ব্যবস্থা তাদের অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফসল, যা আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার। আমাদের সমাজকে তারা তাদের এই কদাকার জীবন দ্বারা প্রভাবিত করতে চাচ্ছে। ইসলামী ব্যবস্থা এরকম অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী। মুসলমানদের কাজকর্ম ব্যক্তি স্বাধীনতার দ্বারা নয় বরং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ তথা হালাল-হারাম দ্বারা বিধিবদ্ধ। আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন সে সকল কাজ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। কোন মুসলমান আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন কাজ করলে গুনাহগার হবে

এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহ যা বৈধ করেছেন কেবলমাত্র সে সকল কাজগুলো করতে পারবে।

গণতন্ত্র বনাম ফেরাউনী ব্যবস্থা :

ইসলামে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতে। এটি আল্লাহ তায়ালার সিফাতের একটি অংশ। ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয় নি। কারণ মানুষের পক্ষে সার্বজনীন আইন প্রনয়ন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

অর্থ: "**আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই।" (সূরা ইউসূফ ১২: আয়াত ৪০।)**

ইসলামে আইন-কানুন কুরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং যে আইন-কানুন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই তা শরীআতের নীতি অনুযায়ী ইজতিহাদ করে বের করে নেবে।

ফেরাউন নিজেকে রব হিসেবে দাবী করার অর্থ এ নয় যে সে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা বা আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করার দাবী করে ছিল। কিংবা এ কথার অর্থ এটাও নয় যে সে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতো না। সে নিজেও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। ফেরাউন নিজেকে রব দাবী করার অর্থ হচ্ছে, সে যেকোন হুকুম জারী করা বা আইন প্রণয়ন করার অধিকার রাখে, সে জন্যই সে নিজেকে রব হিসেবে দাবী করে ছিল। অর্থাৎ তার আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হতো।

এ বিষয়টি আজকে উপলব্ধি করা বেশী জরুরী। ফেরাউন একজন রাস্ট্র প্রধান। সে নিজেও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। কিন্তু সে নিজের রাস্ট্রের সার্বভৌমত্ব দাবী করার ফলে রব সেজে বসল। পবিত্র কুরআনে সূরা যুখরুফের ৫১ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ফেরাউনের সার্বভৌমত্ব দাবী করার সেই ঘটনা শুনিয়েছেন। এছাড়াও সূরায়ে নাজিয়াতের ২৩-২৪ নং আয়াতের মাধ্যমে ফিরআউনের নিজেকে রব বলে দাবী করার কথাও আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। পবিত্র কুরআনে তা আমাদের কাছে বিভিন্ন আয়াতে একাধিক বার তুলে আনা হয়েছে। এ সার্বভৌমত্ব যখন কোন রাজা, বাদশা, প্রধানমন্ত্রী, রাস্ট্রপ্রধান, কোন গোষ্ঠী বা কোন ব্যবস্থা দাবী করে তখন সে রবের আসনে

অধিষ্ঠিত হয়। ফেরাউন সার্বভৌমত্ব দাবী করেছে বলেই রবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

কুরআনের মাধ্যমে ফেরাউনের কাহিনী আমাদের নিকট পেশ করার কারণ আমরা যেন এমন কোন রাজা বাদশাকে বা কোন ব্যবস্থাকে না মানি, যারা সার্বভৌমত্বের দাবী করে বসে। আমরা যেন ফেরাউনদের মতো কোন শাসকদের মেনে নিয়ে শিরকের মধ্যে লিপ্ত না হই। কারণ আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার মানে হচ্ছে তাকে রব বলে স্বীকার করে নেয়া হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ হয়ে দাঁড়ায় সার্বভৌত্বের প্রতীক এবং সকল ক্ষমতার উৎস। এ ব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকানা দাবী করে।
ফেরাউন সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করার ফলে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে রব হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার দাবী করার ফলে সে নিজেই নিজের রব হয়ে যায়। অর্থাৎ জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভু। ফেরাউনকে মানলে যদি শিরক হয় তাহলে এ গণতন্ত্র মানলেও শিরক হবে।
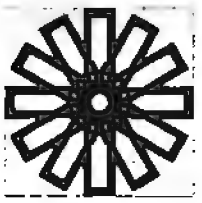
সার্বভৌমত্ব সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। যা ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সুসংহত হয়। কালিমা মানতে হলে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করতে হবে। যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদ দিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব কায়েম করে বা মেনে নেয় তাদের জন্য কালিমা হচ্ছে " লা ইলাহা ইল্লান্নাছ"।

এ হতে এটা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর কিতাবের হালাল-হারামের মাপকাঠি বাদ দিয়ে যারা আইন প্রণয়ন করে তারাও ফেরাউনের মতো একই কাজ করে। তৎকালীন সময়ের ফেরাউনরাও আল্লাহকে স্বীকার করেতো কিন্তু নিজেরা আইন প্রণয়ন করার ভুমিকা পালন করতো। আজকের শাসক শ্রেণীও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করে এবং নিজেরা আইন প্রণয়নকারীর ভুমিকা পালন করে। ফেরাউনকে মান্য করলে আল্লাহর সাথে শিরক করা হতো। তৎকালীন ফেরাউন এবং আজকের এ শাসকশ্রেণীর মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে তেমন কোন পার্থক্য নেই। আজকে যারা আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে সংসদে বসে নিজেদের তৈরি করা আইন মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়, তারা প্রকারান্তে ফেরাউনের ভুমিকাই পালন করছে। এদেরকে সমর্থন করা বা মেনে নেয়ার মানে হচ্ছে ফেরাউনকেই মান্য করা। যা সরাসরি শিরক। মুসলমান

কর্তৃক এ অনৈসলামিক শাসকদের মেনে নিলে তা নব্য ফেরাউনকে মান্য করা বুঝাবে। আজকের নব্য ফেরাউনদের অনুসরণ করে মুসলমানরা যাতে আবার শিরকের মধ্যে হাবুডুবু না খায়, তা থেকে সতর্ক করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের কাহিনী আমাদের কাছে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আজ গণতন্ত্ররুপী নব্য ফিরাউনরা জনগণকে আল্লাহর মুখামুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করলেই অনেকখানি পরিস্কার হয়ে যাবে।

◎ ইসলাম আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা চায়, কখনো তা গ্রহণ করা হবে না।" (সূরা আলে ইমরান ৩, আয়াত ৮৫)। তিনি আরো বলেছেন, "ইসলামই আমার কাছে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা" (সূরা আলে ইমরান ৩, আয়াত ১৯)।
পক্ষান্তরে সরকার বলছে পূঁজিবাদ বা গণতন্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে রাস্ট্রের জন্য মনোনীত জীবন ব্যবস্থা এবং জনগণকে সে ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। এ গণতন্ত্র ইহুদী-খৃস্টানদের তৈরি অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা।

◎ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী।" (সূরা বাকারা ২: আয়াত ২০, ১০৯, ১৪৮, ২৫৯। সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ২৬, সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ১৬৫, সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ১৮৯। সূরা আন নিসা ৪: আয়াত ৮৫। সূরা হাদিদ ৫৭: আয়াত ২)। পক্ষান্তরে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে "জনগণ সকল ক্ষমতার অধিকারী"।

◎ ইসলামে তাওহীদ, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। আল্লাহর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। গণতন্ত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব উপেক্ষিত। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নীরব।

◎ ইসলামে আইনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্। গণতন্ত্রে আইনের উৎস মানুষের খেয়াল খুশি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান বা আইন দেয়ার ক্ষমতা নেই।" (সূরা ইউসূফ ১২, আয়াত ৪০। সূরা কাসাস ২৮, আয়াত ৬৯-৮৮)। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে পার্লামেন্টে বসে এম পি সাহেবরা যেমন ইচ্ছে আইন বানাতে পারবেন।

◎ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "...আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদা ৫, আয়াত ৪৪)। ... আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারাই জালেম। (সূরা মায়েদা ৫ঃ আয়াত ৪৫) ... আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক। (সূরা মায়েদা ৫ঃ আয়াত ৪৭)। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে কোর্ট কাচারীতে আল্লাহর বিচার ব্যবস্থা চলতে পারবে না।

◎ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, " আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে (সূরা বাকারা ২ঃ আয়াত ২৭৫), কিংবা "আল্লাহ তাআলা ক্রয় বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন" (সূরা বাকারা ২ঃ আয়াত ২৭৫)। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও (সূরা বাকারা ২ঃ আয়াত ২৭৮-২৭৯)। পক্ষান্তরে ফেরাউন রুপী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে অর্থনীতিতে সূদের লেনদেন চলবে।

◎ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তোমরা জেনার কাছেও যেও না" (সুরা ইসরা, আয়াত ৩২)। আর বর্তমান রাস্ট্র ব্যবস্থা সহশিক্ষা, ডিশ কালচার, নারী ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ফন্দি-ফিকিরের মাধ্যমে জেনাকে প্রতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার কাজ করছে।

◎ আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের হিজার পরার ব্যাপারে বলেছেন, "আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। (সূরা নূর ২৪, আয়াত ৩১)। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক সরকাররা দেশে দেশে মেয়েদের হিজাব পরার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা, কোথাও কোথাও বাঁধা সৃষ্টি করছে এবং অনেক দেশে হিজাবকে নিষিদ্ধ পর্যন্ত করার দু:সাহস দেখিয়েছে।

◎ ইসলামের লক্ষ্য আত্মিক, পরকাল এবং পার্থিব উন্নতি। আর গণতন্ত্রের লক্ষ্য শুধু ক্ষমতার রাজনীতি।

◎ ইসলামের শিক্ষা নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। আর গণতন্ত্রের শিক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ ভোগবাদ।

মুসলমানরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য কাজ করতে পারবে না কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থার দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করতেও পারবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাই মনোনীত করেছেন। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল কিছুই জাহিল ও বাতিল। কোন মুসলমান কোন জাহিল ব্যবস্থার দিকে কোন মানুষকে আহ্বান করতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-
"আর যে জাহেলী মতবাদ আর আদর্শের দিকে লোকদের আহ্বান করলো, সে জাহান্নামী। যদিও সে রোজা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজকে মুসলমান হিসেবে দাবী করে।"- তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ।

বর্তমান সমাজের মুসলমানগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইসলাম বিরোধী গণতন্ত্ররুপী নব্য ফেরাউনী ও জাহেল ব্যবস্থা মেনে নিয়ে এক মারাত্মক শিরকের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। ফেরাউনকে মেনে নিলে যদি ইলাহ বা রব মানা হয় তাহলে আজকের অনৈসলামী ব্যবস্থা মান্য করলেও ইলাহ মানা হবে। ফেরাউনকে মেনে নিলে যদি শিরক করা হয়, তাহলে আজকের এসকল অনৈসলামী শাসকদের মেনে নিলেও শিরক করা হবে।
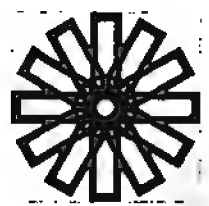
কোন অনৈসলামিক শাসক যারা হালাল-হারামের মাপকাঠি বাদ দিয়ে আইন প্রণয়ন করে, তা ফেরাউনী ব্যবস্থার শামীল। এ ব্যবস্থা মেনে নিলে আইন প্রণেতাকে ইলাহ বা রব মান্য করা হবে এবং তা আল্লাহর সাথে শিরক হবে। তাই এ সকল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা, উৎখাত করা এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করাই হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাবী।

মুসলমানরা কিভাবে তাদের ব্যবস্থা হারালো :

উনিশ শতকের মাঝামাঝি উসমানিয়া খিলাফতের সময় মুসলমানদের যখন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পতন শুরু হয় তখন পশ্চিমারা তাদের মিশনারীর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তীব্রতর করে। এ সময় ইউরোপে রেনেসার উদ্ভব হয়। ফলে ইউরোপিয়ানরা শিল্প বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে এবং

একই সময় উসমানিয়া খিলাফত ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তখনই মুসলমানদের দেশে পশ্চিমা সংস্কৃতি, তাদের চিন্তা, সভ্যতা এবং তাদের ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটে। খিলাফত পতনের পিছনে অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে-

১. মুসলমানগণ কর্তৃক আরবী ভাষার চর্চা ছেড়ে দেয়া। ফলে সমকালীন বিষয়গুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে না পারায় তাদের মধ্যে কিছু ভুল ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে।
২. আরবী ভাষার চর্চা কমে যাওয়ার ফলে তৎকালীন সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে দূর্বল ইজতিহাদ তৈরি হচ্ছিল ফলে দশম খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইজতিহাদ বন্ধ করে দেয়া হয়। এর ফলে সমকালীন বিষয়াবলীর ব্যাপারে ইসলামের সঠিক ফয়সালা নিতে মতভেদ তৈরি হতে থাকে। ফলে অনেকে পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা গ্রহণ করতে থাকে।
৩. এক শ্রেণীর মানুষ মনে করতে থাকে যে ইসলামের আইন-কানুন আপগ্রেড করা দরকার।
৪. কেউ কেউ মনে করতে থাকে যে, যে সকল বিষয়গুলো ইসলামে সরাসরি নিষেধ নেই তা মেনে নেয়া যাবে।
৫. কেউ কেউ মনে করতে থাকে যে ইহুদী-খৃষ্টানরা আল্লাহর কিতাব প্রাপ্ত তাই তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়।

এরকম একটি অবস্থায় পশ্চিমারা মিশনারীর বেশে মুসলমানদের দেশে প্রবেশ করে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কৌশলে অপপ্রচার করে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। মুসলমানদের কাছে ইসলামকে অপছন্দনীয় করে তুলে এবং অনগ্রসরতা এবং পতনের জন্য ইসলামকে দায়ী করতে থাকে। একই সাথে তারা পশ্চিমাদের কালচার, তাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তাদের আইন-কানুনকে বড় করে প্রকাশ করতে থাকে।

তারা ইসলামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষপূর্ণ ধারণা পোষণ করে। তারা বুঝতে পেরেছে যে মুসলমানদের শক্তির উৎস হচ্ছে তাদের আকীদা বা বিশ্বাস। পশ্চিমারা তাদের মিশনারী দ্বারা মুসলমানদের বিশ্বাস বা আকীদাকে আক্রমণ করে। এজন্য তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে এক জঘন্য পরিকল্পনা

বাস্তবায়ন করতে থাকে। তারা মুসলমানদের প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের দিকে আহবান করতে থাকে, যাতে মুসলমানরা তাদের জীবনে পশ্চিমাদের

বিশ্বাসকে ধারণ করে এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংস করার পর এটা তাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে। ফলে তারা ইসলামী হুকুম আহকামের পরিবর্তে কুফর ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

তারা মুসলমানদের সামনে গণতন্ত্রকে এমনভাবে উপস্থাপন করছে যেন ইসলামের সাথে গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার কোন বৈপরিত্য নেই। তারা আস্তে আস্তে মুসলমানদের চিন্তা চেতনার মধ্যে গণতন্ত্রকে হজম করাতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি আজ এক শ্রেণীর মুসলমানরা গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে গলা শুকিয়ে ফেলছেন। যেখানে পশ্চিমা কালচারের সাথে ইসলামী কালচারের বিরোধ হয় সেখানে তারা ইসলামী কালচারকে বর্জন করতে চায়, পশ্চিমারা যেভাবে ইসলামকে অপছন্দ করে তারাও সেভাবে ইসলামকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে। এক শ্রেণীর মুসলমানরাই আজ পশ্চিমাদের মুখপাত্র হিসাবে তাদের কালচার, চিন্তা এবং ব্যবস্থা দ্বারা ইসলামকে আক্রমণ করে চলেছে। অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ইহুদী ও নাছারাদেরকে বিশ্বাস করতে, তাদের সাথে অন্তরঙ্গবন্ধুত্ব স্থাপন এবং তাদের আহ্বানকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেক গুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।" (সূরা আল ইমরান ৩ : আয়াত ১১৮)

আমাদের দেশের মুসলমান নামধারী এক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদরা সাংঘাতিকভাবে পশ্চিমাদের প্রতি এবং তাদের ব্যবস্থার প্রতি অনুগত হয়ে পড়েছে এবং তাদের আদর্শের অনুরূপ হওয়ার চেষ্টা করছে। তারা পশ্চিমাদের কাছ থেকে সাহায্য খুঁজছে এবং পশ্চিমা আইন ও ব্যবস্থাকে গার্ডিয়ান হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা অনুগত চাকরের মতো পশ্চিমাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে এবং তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছে। তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে শত্রুতা করছে। তারা রাজনৈতিক ইসলাম এবং এর দাওয়াতকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করছে। তারা খিলাফত ব্যবস্থার পূন:প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর শাসন ব্যবস্থার গতিরোধ করার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
এক শ্রেণীর ইসলামী রাজনীতিবিদদের বলতে শোনা যায় যে- "ইসলামেও গণতন্ত্র আছে।" নিতান্ত নির্বোধের মতোই তারা এ কথাগুলো বলেন। তারা আসলে "ইসলামও বুঝেন না এবং গণতন্ত্র কি তাও বুঝেন না।" গণতন্ত্রের সাথে আকীদাগত বিরোধগুলোও বোঝেন না। এসকল নির্বোধ মোসাহেবরা তাদের পশ্চিমা প্রভূদের খুশী করার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে বলেন, "হুজুর ইসলামেও গণতন্ত্র আছে।" এভাবে তারা নিজেদের পরাজিত ও তোষামোদী মানসিকতা প্রকাশ করেন।
এর কারণ হচ্ছে ইসলাম এবং এর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের গভীরভাবে না বোঝার দুর্বলতা। অধিকন্তু ইসলামী শরিয়াতের প্রয়োগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা।

ইসলামী ব্যবস্থাবিহীন মুসলমানদের অবস্থা :

বর্তমানেও সমগ্র পুজিবাদী গণতান্ত্রিক বিশ্ব এক হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মত্ত হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনের নেতৃত্বে ২০০ বছরের প্রচেষ্টায় তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ২৮শে রজব ১৩৪২ হিজরী (৩ মার্চ ১৯২৪ সালে) মুসলমানদের খিলাফতের শেষ স্মৃতি চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে সমর্থ হয়। সে থেকেই মুসলিম উম্মাহর সামনে ইসলামিক শরিয়া বাস্তবায়নের শেষ দৃষ্টান্তটুকুও আর অবশিষ্ট থাকল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জন সদম্ভে ঘোষণা করেছিল, "আমরা তুরস্কের খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এটা আর কখনো পূনরুজ্জীবিত হবে না, কারণ আমরা ইসলাম ও খিলাফতের অন্তর্নিহীত শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছি।"

খিলাফত ধ্বংসের পর মুসলিম ভূখন্ডকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। খিলাফতের অবর্তমানে তখন তা রক্ষা করার কেউ ছিল না। তারা কখনো ক্রুসেডের নামে, কখনো সাম্রাজ্যবাদী ও রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে মুসলমানদের উপর চড়াও হয়েছে। কখনো বা অর্থনৈতিক, মানবিক সাহায্যের ছদ্মাবরণে তাদের প্রশিক্ষিত এজেন্টদের মাধ্যমে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছে। খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসের পর ৮৮টি বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু মুসলমানরা তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলা ভূমিকে আর একত্রিত করতে পারে নি। ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মির, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, ভলকান, গুজরাট, আরাকান, সুদান, উজবেকিস্তানে মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা চালিয়েছে, মা বোনদের ইজ্জত লুন্ঠন করেছে।

যেসকল ভূখন্ড মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থার আওতায় ছিল তা হাতছাড়া হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়া দখল করে নিয়েছে পূর্ব তিমুর। চীন দখল করে নিয়েছে মধ্য এশিয়ার সমগ্র ইসলামী প্রদেশ। রাশিয়া দখল করে নিয়েছে ককেসাস এলাকা, ক্রিমিয়া কাজাখিস্থান আরো কয়েকটি এলাকা। ভারতের অধিকারে রয়েছে দীল্লি, কাশ্মিরসহ উত্তর ভারতের মুসলিম এলাকা। আমেরিকা তার সামরিক শক্তি খাটিয়ে সমগ্রপ্রাচ্যসহ পারস্য উপসাগর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে এবং দখল করে রেখেছে আফগানিস্তান। এছাড়াও তূর্কীতে রয়েছে তার বিশাল সামরিক ঘাটি। বৃটেনের মধ্যপ্রাচ্যে প্রাধান্য বিস্তারসহ উপ-সাগরীয় এলাকা এবং জিব্রাল্টার সামরিক উপস্থিতি রজায় রেখেছে। সার্বিয়া, গ্রীক, রোমান এবং বুলগেরিয়াও দখলে রেখেছে মুসলিম ভূখন্ড। স্পেন দখল করেছে আন্দালুসিয়া, সাবটা এবং মালিলা। ইতালি দখল করেছে সিসিলি। ভূমধ্য সাগরের সকল দ্বীপগুলো মুসলমানদের শাসনের আওতায় ছিল তা আজ হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফিলিপিন ও বার্মাও দখলে রেখেছে মুসলিম ভূখন্ড। খিলাফত ব্যবস্থা পতনের মাত্র চার বছর পরে ১৯২৮ সনে আরব ভূমি দখল করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল এবং তার কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মাধ্যমে সনদও দেয়া হয়েছে। এ রাষ্ট্রের সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে আমেরিকা ও কুফরী শক্তিগুলো।

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক শক্তি নানা কলা-কৌশলে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল আগ্রাসন পরিচালনা করছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- মুসলিম ভূখন্ডগুলোকে স্বাধীনতার নামে বিভক্ত করে ফেলা।
- মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমাদের জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো। রাজনৈতিক জীবনে ইসলামের কথা বললেই মৌলবাদী আর সন্ত্রাসী লেবেল দেয়া। যারা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে তাদেরকে সর্ব শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা এবং তাদেরকে জংঙ্গী বা মৌলবাদী হিসেবে তুলে ধরা।
- মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে বিভিন্ন বিষয়াবলীতে খবরদারী করার কাজগুলোতে বৈধতা দেয়ার জন্য জাতিসংঘ কিংবা সিকিউরিটি কাউন্সিলকে অর্থায়ন করা।
- উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া এবং ক্ষমতায় গেলে তাদের মাধ্যমে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা।

খিলাফতের অবর্তমানে আজ মুসলমানদের রক্ষা করার কেউ নেই। আজও মুসলমানদের ভূমি দখল করাসহ তাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে। তাদের চারিদিক থেকে তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখা হচ্ছে। নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, ইরাকে পারমাণবিক অস্ত্রের নিশানাও খুঁজে পাওয়া যায় নি, তারপরও পারমানবিক অস্ত্রের অজুহাতে কাফেররা সেখানে হামলে পরে, অথচ উত্তর কোরিয়া প্রকাশ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের ঘোষণা দিলেও পুঁজিবাদীরা সেদিকে তাকায় নি। কারণ ইরাকের সাথে যুদ্ধ বাধালে সেখান থেকে তেল লুণ্ঠন করা যাবে। সেজন্য কুফর ব্যবস্থার ধারকরা বিনা কারণে ইরাকে হামলা চালিয়েছিল। আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নানা ছলছুতায় হামলা চালানোর মূলে রয়েছে সে সকল দেশের তেল সম্পদ। একজন আমেরিকান সৈন্য বলেছিল যে "আমরা সৃষ্টিকর্তার ভূলকে সংশোধন করতে এসেছি, কারণ তিনি তেল সম্পদকে পশ্চিমা দেশগুলোতে না দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে দিয়েছেন।" -নাউযুবিল্লাহ।

পৃথিবীতে ইসলাম যদি ফিরে আসে তাহলে কুফরদের সূদ ভিত্তিক ব্যবস্থা থাকবে না, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আই এম এফের দাদাগীরি থাকবে না, মদ আর বেহায়াপনার রমরমা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। মুসলমান ভূখন্ড থেকে সম্পদ পাচার বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ইসলামের পূনঃজাগরণে ওদের এত ভয়। সেজন্য পৃথিবীর যেখানে ইসলাম ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেখানেই কাফেররা বিনা অজুহাতে খড়গ হাতে হাজির হয়। আজকে মুসলমান ভূখন্ডে অকারণে আক্রমণ তারই সাক্ষ্য বহন করে।

আজ মুসলিম ভূখন্ড গুলোতে শাসকের নামে পাশ্চাত্যের এজেন্টদের ক্ষমতায় বসানো হচ্ছে। এসকল শাসকরা ক্ষমতায় বসে কেবলমাত্র তাদের প্রভূদের এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করে চলেছে। আমরা ক্ষোভের সাথে প্রত্যক্ষ করছি যারা মুসলমানদের নিয়ে প্রতিনিয়ত হীন পরিকল্পনায় ব্যস্ত, তাদের সাথে এক শ্রেণীর মুসলিম শাসকদের সখ্যতা আর মাখামাখি, ক্ষমতার উচ্ছিষ্টে কামর দিয়ে থাকার জন্য প্রভুদের পদলেহনে নির্লজ্জ নতজানু প্রচেষ্টা। মুসলিম বিশ্বে তাদের এজেন্ট এবং দালালদের যে সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

- মিডিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করে তা পুঁজিবাদী সভ্যতার পক্ষে প্রচারের জন্য ব্যবহার করা।
- মুসলিম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বস্তরের সিলেবাসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে পাশ্চাত্য ধারণা বিস্তার করা এবং ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করাসহ ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস মুছে ফেলার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

- মুসলিম দেশে পশ্চিমাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে যুব সমাজকে তাদের ভাবধারা অনুযায়ী তৈরি করা।
- রাজনৈতিক দলকে পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতাকে ধারণ করা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে আহ্বানের কাজ করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে সুরক্ষিত করা।
- শিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের চিন্তা চেতনায় পাশ্চত্য ভাবধারা প্রবেশ করিয়ে তাদেরকে হাইলাইট করা এবং তাদের কর্মকান্ড তুলে ধরা যেন তারা মুসলিম দেশসমূহে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রয়োজনে তাদের কাজে লাগানো যায়।
- শিক্ষামূলক বৃত্তি দেয়া এবং বিভিন্ন কোর্সের অর্থায়ন করা এবং এ প্রক্রিয়া থেকে তাদের জন্য এজেন্ট নির্বাচন করা।
- ক্লাব, কেন্দ্র বা এ জাতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করা এবং এসকল প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের কালচারকে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- আরবী ভাষা চর্চায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা এবং জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা মোহ তৈরি করে ইসলামী চেতনা ধ্বংস করা।

কিন্তু দীর্ঘ দিনের দূর্ভাগ্য ও দুরাবস্থার পর মুসলিম উম্মাহ যখন আজ বুঝতে পেরেছে যে কেবলমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই তাদের সকল দুরাবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে, আসলে তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ততক্ষণে তাদের সরকার, সেনাবাহিনী, আইন-কানুন, অর্থনীতি, সমাজ, জীবন, নিরাপত্তা, জীবনের দৃষ্টি ভংগী, চিন্তা-শক্তি, কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি এবং তাদের সত্ত্বাকে ইসলাম থেকে আলাদা করার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। পৃথিবীতে যাতে আর ইসলামের আলো পৌঁছতে না পারে, মানুষরা যাতে জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করতে না পারে তার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলা হয়েছে। কুফররা স্পষ্টই বুঝতে পারছে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর পৃথিবীতে এখন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কেবলমাত্র ইসলামেরই পূনঃজাগরণ হতে পারে। আজ মুসলিম উম্মাহকে দৃঢ়ভাবে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে।

ইসলামী শাসন বনাম অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা :

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নাম হচ্ছে খিলাফাহ। এর মূল ভিত্তিই হল একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বে আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর স্বার্বভৌমত্বের বাইরে যাওয়ার

এবং নিজেরা নিজেদেরকে স্বার্বভৌম বলে দাবী করার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ.

অর্থ: "বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়।" (সূরা সূরা ইউসুফ ১২, আয়াত ৪০)

তাওহীদের উপর ভিত্তি হওয়ার কারণে ইসলামের "খিলাফত" পাশ্চাত্যের ধর্ম-নিরপেক্ষ, স্রষ্টার কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণমুক্ত গণতন্ত্র কখনই এক হতে পারে না।

খিলাফত কোন রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয় কিংবা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণও নয়। খিলাফত শাসন ব্যবস্থায় খলীফা নিয়োগ করার পদ্ধতি হল বায়াত। এ ব্যবস্থা খলীফাকে এমন কোন অধিকার দেয় না, যাতে তিনি জবাবদিহিতীর উর্দ্ধে বিবেচিত হবেন। বরং বিচার বিভাগের সামনে তাকে সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা কোন মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। খলীফার সমস্ত কাজ, সিদ্ধান্ত এবং জনগণের স্বার্থসংশিষ্ট বিষয়সমূহ দেখভাল করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা দ্বারা নির্ধারিত। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ নেই।

সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের ক্ষমতাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ (Colony) স্থাপন করে সে অঞ্চলসমূহকে শোষণ করে কেন্দ্রকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় জাতি ও বর্ণভেদে এ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরা শাসিত হয়েছে। যদিও এ অঞ্চলগুলো সব সময় একটি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল না। খিলাফত রাষ্ট্র কখনই তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহকে উপনিবেশ হিসেবে দেখে না এবং এ অঞ্চলগুলো থেকে ধনসম্পদ লুটপাট করে কেন্দ্রকেও সম্পদশালী করে না। বরং খিলাফত রাষ্ট্র সব অঞ্চলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখে, তা কেন্দ্র থেকে যত দূরেই অবস্থিত হোক না কেন, কিংবা সে অঞ্চলের মানুষ যে বর্ণেরই হোক না কেন। এ রাষ্ট্র প্রতিটি অঞ্চলকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে এবং প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ কেন্দ্রে বসবাসকারী নাগরিকের মতই সমান নাগরিক সুবিধা ভোগ করে। একই সাথে এ রাষ্ট্র এর অধীনস্থ সকল অঞ্চলে একই শাসন কর্তৃত্ব, কাঠামো এবং আইন-কানুন প্রয়োগ করে।

খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থার মতোও নয়, যেখানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে এবং সাধারণ কিছু আইনকানুন দিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকে। প্রকৃত অর্থে, খিলাফত একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা। এ রাষ্ট্রে সব অঞ্চলের জন্য সমানভাবে অর্থায়ন করা হয়। একইভাবে নির্ধারণ করা হয় বাজেট। প্রতিটি প্রদেশের জন্য ন্যায্যভাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করা হয়।

খিলাফত ব্যবস্থা প্রজাতান্ত্রিক (Republic) শাসন থেকেও ভিন্ন :

রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিষ্ঠুর আচরণের ফল স্বরূপ প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেখানে রাজা-বাদশাহরা ছিল স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্বেচ্ছাচারী এবং তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্য ও জনগণকে শাসন করত, রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন। সেখানে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের কাছে সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব হস্তান্তরের চেষ্টা চালায়। ফলে, মানুষ আইন প্রণয়ন করতে শুরু করে এবং সেই সাথে জনগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কিছু অনুমোদন ও নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। উপরে বর্ণিত প্রতিটি (প্রজাতান্ত্রিক) ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামে মানুষের (মৌলিক) আইন তৈরির কোন অধিকার নেই। এ অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন ব্যাপারে অনুমতি প্রদান বা নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষমতা নেই। বস্তুতঃ ইসলাম মন্ত্রী পরিষদ দ্বারা শাসিত কোন ব্যবস্থা নয়। এখানে খলীফা তার গুরুভার লাঘব করার জন্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী (Delegated Assistants) নিয়োগ করতে পারেন। এই সহকারীগণ কেবলমাত্র খলীফার সহকারী হিসাবে বিবেচিত হন। যারা খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনে খলীফাকে সহায়তা করেন।

সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথেও মূলনীতি এবং প্রক্রিয়াগতভাবে খিলাফত পদ্ধতির শাসনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। মহান আল্লাহকে অস্বীকার করা, ধর্মকে আফিম বা নেশার মতো ক্ষতিকর আখ্যায়িত করে সমাজ ও রাষ্ট্র তো পরে এমনকি মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকেও ধর্মের নাম নিশানা মুছে দেয়ার এক বিশাল তান্ডবের সাথেই সূচিত হয়েছিলো সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও পথচলা। সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবক ও প্রবক্তাদের প্রায় সকলেই ছিলো মহান আল্লাহকে সরাসরি অস্বীকারকারী নাস্তিক।

এছাড়াও সমাজতন্ত্র মানুষের ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করে সকল সম্পদ এককভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত বলে ঘোষণা করে। অথচ এটিও সম্পূর্ণ অনৈসলামিক মূলনীতি। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-যাপনে স্বেচ্ছাচারিতা

ও যথেচ্ছাচারকে নিষিদ্ধ করলেও ব্যক্তি মালিকানাকে নিষিদ্ধ করেনি। সকল সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক সম্পদের মালিক হওয়ার মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদাকে অস্বীকার করেনি। বরং এক্ষেত্রে ইসলাম একদিকে যেমন পুঁজিবাদের মতো সকল সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়াকে সমর্থন করে নি, একইভাবে সমাজতন্ত্রের মতো সকল সম্পদ রাষ্ট্র কর্তৃক কুক্ষিগত করাকেও স্বীকৃতি দেয় নি। বরং সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা, জনগোষ্ঠির সামষ্টিক মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা হিসেবে সম্পদের তিনটি পর্যায় নির্ধারণ করে সমগ্র মানব জাতির জন্য ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে।

রাষ্ট্র ছাড়া ইসলাম বাস্তবায়ন সম্ভব নয় :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি নিছক কোন ধর্ম নয়। মানুষরা পৃথিবীতে কিভাবে জীবন পরিচালনা করবে, কিভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করবে, সম্পত্তির বন্টন কিভাবে হবে, সমাজ ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব কি হবে, একজন মানুষ কোন কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারবে, বিচারকার্য কিভাবে করবে, রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে, পররাষ্ট্র নীতি কি হবে এর যাবতীয় আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য কোরআনকে বলা হয়েছে পূর্নাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্য জীবন ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে- সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম, পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র। পৃথিবীতে কোন জীবন ব্যবস্থা রাস্ট্র ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যেমন আমরা জানি যে USSR বা সোভিয়েত ইউনিয়নে এক সময় কমিউনিজম নামক জীবন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। তখন একটি বিশাল ভূখন্ড জুড়ে এ জীবন ব্যবস্থা নেতৃত্ব দিয়েছিল। এ জীবন ব্যবস্থা মাত্র ৭০ বছর টিকে ছিল। বর্তমানে আমেরিকা এবং ইউরোপ জুড়ে পুঁজিবাদ বা গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা কায়েম আছে। আজকে তারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

মুসলিমদের মধ্যকার যে কোনো বিরোধ ও মিমাংসাও হতে হবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে। নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে মুসলিমদের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতিমালার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। ইরশাদ হয়েছে,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থ: "অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তার ফায়সালা ও সমাধানের জন্যে তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাকো।" (সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)

অপর এক আয়াতে আরো দৃঢ় ও কঠিন ভাষায় ইরশাদ হয়েছে:

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থ: "আপনার রবের শপথ! কখনোই তারা কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যকার ব্যাপারে আপনাকে সালিশ না মানবে। অতঃপর আপনি যেই ফায়সালা করে দিবেন সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনের মধ্যে আর কোন ধরনের জড়তা ও সংকোচ অনুভব না করবে এবং দ্বিধাহীনচিত্তে পূর্ণরূপে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিবে।" (সূরা নিসা, ৪: আয়াত ৬৫)

উম্মাহ্কে অবশ্যই রাসূল সা. এর পরে এমন একজন শাসক নিযুক্ত করতে হবে যিনি আল্লাহ'র কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং এ নির্দেশটি অবশ্য পালনীয় অর্থাৎ ফরয। রাসূল সা. এরপর আল্লাহ'র আইন দ্বারা মুসলিমদের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যাকে নিয়োগ করা হবে তিনিই খলীফা। একইভাবে সেই শাসন পদ্ধতির নাম হল খিলাফত। সুন্নাহ্ ভিত্তিক দলিল-প্রমাণের দিকে আমরা আলোকপাত করলে দেখতে যায় এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن ابن عمر قال سمعت رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: مَنْ مَاتَ وَلَـــا بَيْعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

অর্থ: "ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি বাইআ'ত বিহীন মারা গেল সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।" (তাবরানী ১/৭৯ নং ২২৫, জামেউল আহাদীস ২৩৯৩৮, কানযুল উম্মাল ৪৬২)

উপরোক্ত হাদীসটি যেহেতু প্রত্যেক মুসলিমের কাঁধে বায়াতের শপথ থাকাকে বাধ্যতামূলক করেছেন, তাই একইসাথে এ হাদীসটি মুসলিমদের উপর

একজন খলীফা নিযুক্ত করাকেও বাধ্যতামূলক করেছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আল-আরাজ ও সেই সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন,

إنما الإمام جنة. يقاتل من ورائه ويتقى به.

অর্থ: "নিশ্চয়ই খলীফা বা ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরূপ। মুসলিমরা তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করে এবং নিজেদের আত্মরক্ষা নিশ্চিত করে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪১)

দুখের বিষয় আজকাল এক শ্রেণীর পীর সাহেবরা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা উম্মাহকে ভূলিয়ে রাখার জন্য নিজেরা খলিফা দাবী করেন এবং বায়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু ইসলামের শ্রেষ্ঠ সমঝদার সাহাবাগণও এরকম বায়াত গ্রহণ করেন নি। বায়াত গ্রহণ করেছেন ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা। রাসূল সা. এর পরে কেবলমাত্র খলীফাকেই বায়াত দেয়া যায়। যা সুন্নাহ থেকে পরিস্কারভাবে আমরা জানতে পেরেছি। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে,

اَلْبَيْعَةُ لَا تَكُوْنُ إِلَّا لِوَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ يُبَايِعُهُ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ، وَهُمْ الْعُلَمَاءُ وَالْفُضَلَاءُ وَوُجُوْهُ النَّاسِ ، فَإِذَا بَايَعُوْهُ ثَبَتَتْ وَلَايَتُهُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَىْ عَامَّةِ النَّاسِ أَنْ يُبَايِعُوْهُ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْتَزِمُوْا طَاعَتَهُ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَىْ

অর্থ: "বায়াত নেওয়ার অধিকার একমাত্র মুসলিম খলিফার। তার কাছে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বায়াত দিবে। তারা হচ্ছে উলামা এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। যখন তারা খলিফার কাছে বায়াত দিবে তার কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। প্রত্যেক জনসাধারণ আলাদাভাবে বায়াত দেয়া ওয়াজীব নয়। বরং তাদের জন্য ওয়াজীব হচ্ছে খলিফার আনুগত্যকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া আল্লাহর নাফরমানী ছাড়া।" (-বাইআতু জামাআতিত্ তাওহীদ ওয়াল জিহাদ)

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা যখন রাস্ট্রে কায়েম কায়েম ছিল তখন তা অর্ধেক পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পরেছিল এবং এ ব্যবস্থা পৃথিবীকে ১৩০০ বছর পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছিল। তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সর্বশেষ ইসলামী ব্যবস্থার পতন হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় নবুয়তের দশম বছর থেকে কিংবা পবিত্র মিরাজের পর থেকে তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য

জন্য রাষ্ট্রীয় ভূখন্ড তালাশ করছিলেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন যোদ্ধা সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছিলেন। গোত্র প্রধানদের কাছে সহায়তা চেয়েছিলেন। এভাবে তিনি ৪০টি গোত্র প্রধানদের কাছে সহায়তার অহ্বান জানিয়েছিলেন। মদীনার আউস এবং খাজরাজ গোত্র নিঃশর্তভাবে সহায়তা প্রদান করতে প্রস্তুত হওয়ায় তিনি তাদের সহায়তা গ্রহণ করতে রাজি হন। পরিশেষে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে মদীনায় গমন করেন এবং মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি জাহেলিয়াতের ধ্বংসস্তুপের উপর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বীনকে পুরোপুরিভাবে কায়েম করেন, মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রদান করেন। আজকে এক শ্রেণীর মানুষরা না বুঝে বলেন যে, আপনারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছেন। তাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, রাষ্ট্র ছাড়া কোন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাও রাস্ট্র ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ ইসলামী রাস্ট্রই অত:পর দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দিবে। এভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অর্ধেক পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরেছিল এবং ইসলাম অন্য জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয় অর্জন করেছিল। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, কোন জীবন ব্যবস্থা রাস্ট্র ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

ইসলামী আইন-কানুনগুলো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কিছু ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর অধিকাংশই রাস্ট্রকে বাস্তবায়ন করতে হয়। তাহলে ভাববার বিষয়, উম্মাহ্ কি রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মতো ইসলামী ব্যবস্থা রাস্ট্রে কায়েম করে সকল হুকুম আহকামগুলো প্রয়োগ করবে, না কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কিছু ইবাদত আর ফজিলত বয়ানের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকবে? এ ইসলামী বাস্ট্রই আল্লাহর হুকুম-আহকামগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে এবং তা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ বা খলিফাকে মান্য করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃপক্ষ তাদের।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯)
এখানে কর্তৃপক্ষ বলতে ইসলামী রাস্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে বুঝানো হয়েছে।

গণতন্ত্র মানে কেবল নির্বাচন নয় :

কেউ কেউ নির্বাচনকেই গণতন্ত্র মনে করেন। আসলে নির্বাচন হচ্ছে গণরায় যাচাই করার পদ্ধতি। ইসলামেও উম্মাহর রায় বা মতামত যাচাই করার স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে, খলিফা নির্বাচন করার জন্য প্রয়োজনে নির্বাচন বা এ ধরণের কোন নির্বাচন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে যে নির্বাচন দেয়া হয় তা ইসলাম কায়েমের জন্য নয়, তা হচ্ছে বর্তমান পূঁজিবাদী ব্যবস্থা কে পরিচালনা করবে? তার শাসক নির্বাচনের জন্য। এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে আগে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, অতঃপর তা কে পরিচালনা করবে, তার জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। ব্যবস্থা কায়েমের আগে নির্বাচন করার অর্থ হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা। তাতে বর্তমান অনৈসলামী ব্যবস্থাই বহাল থাকে। যা একজন মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

শূরা ও পার্লামেন্ট এক জিনিস নয় :

এক শ্রেণীর মানুষ পার্লামেন্টকে শুরাহ'র সাথে মিলিয়ে ফেলতে চায়। প্রকৃতপক্ষে শূরা সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধ এবং শাসকের কাজের জবাব দিহীতা করে থাকে।

◎ শূরা শরিয়াহ ব্যতীত অন্য কোন আইনে সুপারিশ করতে পারে না। পক্ষান্তরে র্পালামেন্ট শরিয়া অনুযায়ী সুপারিশ করতে বাধ্য নয়। এখানে মানুষরা যেভাবে ইচ্ছে করে সেভাবে আইন প্রণয়ন করবে।

◎ পার্লামেন্টে সংখ্যা গরিষ্টতা হচ্ছে মতামত গ্রহণের মানদন্ড। শুরাতে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের কোন ভিত্তি নেই। যে কারো মতামত খলীফা গ্রহণ করতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে নাও করিতে পারেন।

◎ পার্লামেন্টের সদস্যগণ কুরআনকে বর্জন করে বর্তমান মানব রচিত সংবিধানের শপথ গ্রহণ করেন।

◎ পার্লামেন্ট হচ্ছে আইন সভা, এখানে মানুষেরা আইন প্রনয়ন করে যা আল্লাহ তায়ালার সিফাতের অংশ এবং পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণ করা শিরকের পর্যায়ে পরে।

◎ শূরা সদস্যগণ নিজেরা পদপ্রার্থী হতে পারে না; আত্মপ্রচারে জড়িত হতে অক্ষম; কোরআন ও সুন্নাহর ঘোষিত ও স্বীকৃত দোষাবলীর ধারক হতে পারবেন না। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের নির্বাচনে নিজেরা নিজেদের পদপ্রার্থী হন।

আত্মপ্রচারমূলক অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং কোন ঐশী আইনের অনুসরণে নিজ চরিত্র সংশোধনে বাধ্য নন।

-তাই পার্লামেন্ট এবং শূরা একই জিনিস নয়।

ভোট দিয়ে ব্যবস্থা বদলায় না :

যারা ইসলামী ব্যবস্থার জন্য কাজ করছেন তাদেরকে একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, ভোট দিয়ে কোন দিন ব্যবস্থা বদলায় না। বরং প্রচলিত ব্যবস্থাটি কারা পরিচালনা করবে, তার জন্য ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচন করা হয়। 'জনগণ ইসলাম চায়, না গণতন্ত্র চায়' সে জন্য নির্বাচন দেয়া হয় না। মুসলমানদের প্রথম প্রয়োজন তাদের ব্যবস্থা কায়েম করা। অর্থাৎ পুঁজিবাদী বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাদ দিয়ে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করা। শুধুমাত্র কিছু নেতাকে অপসারণ করে বা নতুন কিছু লোককে ক্ষমতায় বসিয়ে ব্যবস্থা বদলানো যায় না। শাসনব্যবস্থা বদলানোর জন্য প্রয়োজন জনমত তৈরি করা এবং গণআন্দোলন। পৃথিবীতে যতবার ব্যবস্থার বদল হয়েছে তা গণআন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছে। ভোট দিয়ে পৃথিবীতে কোন দিন কোন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। আলজেরিয়াতে ইসলামিক সলভেশন ফ্রন্ট নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় গিয়েছিল কিন্তু পশ্চিমাদের বিশ্বাস ঘাকতকার ফলে সেখানে ইসলাম কায়েম হতে পারে নি। বাস্তবতা থেকেও আমরা এর উদাহরণ নিতে পারি। যেমন-

◎ চীনের সমাজতান্ত্রিক গণবিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে, ভোট দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় নি।

◎ রাশিয়াতে কমিউনিজমে বীতশ্রদ্ধ জনগণ যখন তা বাতিলের দাবীতে রাস্তায় নেমে এসেছিল, তখনই সে দেশে কমিউনিজম ব্যবস্থার পতন হয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে। ভোট দিয়ে সেখানে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় নি।

◎ আমাদের দেশে নব্বই দশকে স্বৈরাচারের পতন যখন গণদাবীতে পরিণত হয়েছে. মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে, তখনই স্বৈরশাসন ব্যবস্থার পতন হয়েছিল।

তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য লোক তৈরি করতে হবে, ইসলামের চাহিদাকে গণদাবীতে পরিণত করতে হবে, তখনই গণআন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করা যাবে। একজন

দাওয়াকারীকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য, কারো পক্ষ্যে ভোটের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নয়, বরং ইসলামের চাহিদাকে গণদাবীতে পরিণত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করতে হবে।

প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে আপোষ করে ইসলাম কায়েম করা :

সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার সাথে মিলেমিশে ইসলাম কায়েম করার জন্য কাজ করছেন। আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা এবং তা বাস্তবায়ন করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। এর নিজস্ব ফিকরাহ এবং তরিকাহ রয়েছে। আবার বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও একটি জীবন-ব্যবস্থা, তাও বাস্তবায়ন করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। একটি জীবন-ব্যবস্থার পদ্ধতি দ্বারা পৃথিবীতে কখনো আর একটি জীবন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে এটি কোন দিন হয়নি। যারা বর্তমান ব্যবস্থা অপসারণ করে ইসলমী ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করতে চান, তারা যদি এ ব্যবস্থার মধ্যেই ঢুকে পড়েন, তাহলে তা অপসারণ করবেন কিভাবে? মূলতঃ এর দ্বারা তারা অনৈসলামী ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনছেন। হারামকে নিজেদের সুবিধা মতো হালাল করে চালিয়ে দিচ্ছেন। আরো সহজ ভাবে বলা যায়, যে গাছ উপরে ফেলতে চান, তারা যদি সে গাছের ডালে উঠে বসে থাকেন, তাহলে গাছটি আদৌ উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে কি?

সবচেয়ে বড় বিষয় হচেছ আমাদেরকে পদ্ধতি নিতে হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন থেকে। তিনি যেভাবে কাজ করেছেন তা খতিয়ে দেখতে হবে। মক্কাতে দারুন নদওয়া নামক বিধানসভা ছিল। সেখান থেকে আবু লাহাব, আবু জাহেলরা সমাজ ও গোত্র পরিচালনা করতো। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য দারুন নদওয়ার সদস্য হননি। কিংবা এমন মনে করেননি যে, তাদের সাথে কিছুদিন মিলেমিশে কাজ করে শক্তিশালী হয়ে নিই। তাহলে কেউ ইসলাম কায়েমের নামে অন্য ব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করাকে কিভাবে বৈধতা দেয়া যাবে ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়ে তৎকালীন আরব নেতৃত্ব বিভিন্ন দরকষাকষি, সমঝোতা ও

আপোসের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্পদ, নেতৃত্বের ভাগাভাগি ও রাজত্ব দান করার প্রস্তাব দিয়েছিল কিংবা আপোসে এক বছর মূর্তি পূজা আর এক বছর আল্লাহর ইবাদত করার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিংবা এও বলেছিল যে, হযরত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাদের পৌত্তলিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা না বলেন। এ ঘটনার পরে সুরা কাফিরুন নাযিল হয় এবং তাতে কোনও রূপ আপোসের নীতি গ্রহণ না করার আল্লাহর নির্দেশ আসে। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে কোন আপোষ কিংবা কুফর ব্যবস্থার সাথে কখনোই মিলেমিশে কাজ করেন নি।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম কায়েম করার জন্য বনু আমির গোত্রের সহায়তা আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু বনু আমির গোত্র প্রধান বলেছিল যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর নেতৃত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এই প্রস্তাবের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আপোষ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি এবং তাদের সহায়তাও নেন নি।
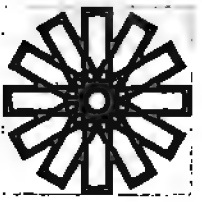
ইসলাম কখনোই জাহেলিয়াতের সাথে সহাবস্থান করতে পারে না, কিংবা অর্ধেক ইসলাম আর অর্ধেক জাহেলিয়াত মেনে নিতে পারে না। হয় আল্লাহ্‌র আইন পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা মানব-রচিত জীবন-ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামের সংগ্রাম চলতে থাকবে। এভাবে কোন অনৈসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে যোগ দিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম প্রয়োগের বিনিময়ে বাকি সমস্ত কুফর ব্যবস্থাকে সমর্থন জানানো বা মেনে নেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতির অংশ নয়। তাই এটি পরিস্কার যে, অনৈসলামী ব্যবস্থার সাথে আপোস করে কাজ করা দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি হতে পারে না।

হোদায়বিয়ার সন্ধির উদাহরণ :

আমাদের সমাজের মধ্যে কেউ কেউ প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে আপোষ করাকে হোদায়বিয়ার সন্ধির সাথে তুলনা করে তার বৈধতা দিতে চান। কিন্তু এ যুক্তি আদতে টিকে না। হোদায়বিয়ার সন্ধির থেকে নিম্নোক্ত বিষয় অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে উপলব্ধি করতে হবে।

হোদায়বিয়ার সন্ধিতে উভয় পক্ষ নিজের অবস্থানে রয়েছে, কেউ কারো ব্যবস্থাকে মেনে নেয়নি বা গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ হযরত হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুফর ব্যবস্থা মেনে নেননি। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিতে কিছু ইসলামী দল পূঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। এ ব্যবস্থায় আনুগত্যের জন্য শপথ উচ্চারণ করেছে এবং এ ব্যবস্থায় আইন প্রনয়ন করতে গিয়ে শির্কি প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছে।

◎ হোদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল দু'টি রাস্ট্রের মধ্যে। এটি ছিল মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির অংশ। কিন্তু বর্তমান আপেষ রফায় ইসলামী রাস্ট্র পক্ষ অনুপস্থিত।

◎ কোন কাজ করতে গিয়ে, তা করা যাবে কিনা মুসলমানরা তার জন্য কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স অনুসন্ধান করে এবং রেফারেন্স পেলে সে অনুযায়ী কাজ করে। কিন্তু এখানে একটি অনৈসলামী কাজ সংঘটিত করে তাকে বৈধতা দেয়ার জন্য বিভিন্ন ছলচাতুরীর উদাহরণ তালাশ করা হচ্ছে। তাই এ অবস্থা হোদায়বিয়ার সন্ধির সাথে কোন তুলনা হতে পারে না।

কাঁবা ঘরে মূর্তি রেখে ইবাদত করা :

অনেকে প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে কাজ করাকে বৈধতা দেয়ার জন্য এভাবে যুক্তি প্রদর্শন করতে চান যে হযরত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁবার ঘরে মুর্তি থাকা অবস্থায় তার দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। নিম্নোক্ত কারণে এ যুক্তি এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

কাঁবার দিকে নামায আদায় করা ফরয কারণ, তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হুকুম। তাই মুর্তি থাকা অবস্থায়ও কাঁবার দিকে ফিরে নামায আদায় করতে হয়েছে। আর শিরকী ব্যবস্থা বর্জন করা হচ্ছে ফরয। তাই এটা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই মুর্তি থাকা অবস্থায় কাবার দিকে ফিরে নামায পড়ার সাথে সংসদে শিরকি ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার কোন তুলনা চলতে পারে না।

পর্যায়ক্রমে দ্বীন কায়েম করা :

এক শ্রেণীর ইসলামী রাজনীতিবিদদের ধারণা একবারে ইসলাম কায়েম করা খুব দূরহ ব্যবপার। তার চেয়ে যতটুকু পারা যায় আস্তে আস্তে আগাতে হবে। ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রয়োগ করার মানে হচ্ছে, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো, যা কুরআনে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে মিলে মিশে আস্তে আস্তে দ্বীন কায়েমের কাজ করতে হবে। একসাথে দ্বীনের হুকুম-আহকামগুলোর বাস্তবায়ন এখন সম্ভব নয়।

তারা অনেক সময় যুক্তি হিসেবে বলেন যে "পবিত্র কুরআনও পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে"। আবার "মদও পর্যায়ক্রমিক ভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে"। আবার কখনো বলেন যে, যেহেতু একই সাথে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, তাই যতটুকু পারা যায় ততটুকু করতে হবে। একদম না পারার চেয়ে কিছুটা পারা অন্তত ভাল - এসকল যুক্তি দেখিয়ে থাকেন। এবারে এসকল যুক্তির অসারতা লক্ষ্য করা যাক।

◎ উপরোক্ত যুক্তি কখনোই শরিয়াহ সম্মত নয়। যারা মনে করেন যে, ইসলাম এখন একসাথে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তারা নিজের অজান্তেই এটা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, "ইসলাম বর্তমান সময়ে একটি অবাস্তব দ্বীন, যা একসাথে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।" -নাউযুবিল্লাহ। প্রথমতই এরকম ধারণা আক্বীদাগত দিক থেকে ঠিক নয়।

◎ এ শ্রেণীর মানুষের অবগতির জন্য বাস্তবতা থেকে বলছি, রাশিয়াতে ৯০ দশকের প্রথম দিকে সমাজতন্ত্র নামক ব্যবস্থার পরিবর্তে পুঁজিবাদী নামক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে। তা কিন্তু পর্যায়ক্রমিকভাবে বা আস্তে আস্তে হয়নি। মানুষের মধ্যে যখন পুঁজিবাদের জন্য চাহিদা তৈরি হয়েছে, তখন গণআন্দোলনের মাধ্যমে একই সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন হয়েছে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন ব্যবস্থার পরিবর্তন মূলতঃ এভাবেই হয়ে থাকে।

◎ যারা বলেন যে, কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে, তাদের বুঝতে হবে যে কুরআনের আয়াতসমূহ কোন অবস্থা বা সমস্যার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান হিসেবে নাযিল হয়েছে এবং কুরআনের কোন আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল তখন সাথে সাথে পুরোপুরি পালন করা হয়েছে। নাযিল হওয়ার পর পর্যায়ক্রমিকভাবে পালন করার কোন সুযোগ ছিল না।

আল্লাহ'র আহ্বানে সাড়া দিতে হবে :

আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তা থেকে এটি দিবালোকের মতো পরিস্কার যে, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পশ্চিমা গণতন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতা এ সকল কিছু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এগুলো হচ্ছে কুফরি চিন্তা, কুফর আইন এবং কুফর সাংস্কৃতি। কেউ কেউ হয়তো অজ্ঞতা কিংবা অসাধুতা থেকে বলেন যে ইসলাম থেকে গণতন্ত্র এসেছে, এজন্য তারা ইসলামী শুরাহ, জবাবদিহিতা, ইত্যাদিকে উল্লেখ করে থাকে। আসলে বাস্তবতা যার সম্পূর্ণ বিপরীত যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা

করা হয়েছে। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের অনেক আকীদাগত পার্থক্য রয়েছে। সংক্ষেপে:

◎ গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের তৈরি একটি জীবন-ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব বিবেচনা করা হয়। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা। ইসলামে সকল সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আল্লাহর।

◎ 'ধর্ম জীবন থেকে আলাদা' এটি গণতন্ত্রের আকীদা। এ আকীদা জীবনের কর্মকান্ডে আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করার শামীল। কোন মুসলমান জীবনের কর্মকান্ডে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারে না।

◎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা, মালিকানার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইসলামের আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক।

◎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষেরা আইন রচনা করে যা শিরক। ইসলামে মানুষ নিজ থেকে কোন আইন রচনা করতে পারে না।

◎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কোন অন্যায় কাজকেও বৈধতা দিতে পারে। আর ইসলামে দুনিয়ার সকল মানুষ একত্রিত হয়ে মতামত দিলেও একটি হারামকে কোন দিন বৈধতা দেয়া যাবে না।

তাই মুসলমানদের জন্য এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা, এ ব্যবস্থার প্রতি আহবান করা, এ ব্যবস্থার ভিত্তিতে কোন দল গঠন করা, আথবা এ ব্যবস্থা থেকে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা, তা প্রয়োগ করা হারাম। মুসলমানদের জন্য গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা বাধ্যতামূলক। এটি একটি তাগুতী শাসন ব্যবস্থা। এটি হচ্ছে কুফর, কুফর চিন্তা, কুফর ব্যবস্থা, কুফর আইন যার সাথে ইসলামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। মুসলমানদের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সমাজে রাষ্ট্রে সম্পূর্ণভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করা ফরজ।

আল্লাহ সুবাহনাহু তায়ালার অনুগ্রহে মুসলিম উম্মাহ আজ দিকে দিকে জেগে উঠছে। মুসলিমরা বুঝে উঠতে শুরু করেছে যে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নিকট থেকে তাদের উপর ফরজ দায়িত্ব। মুসলমানরা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা ও খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেগে উঠতে শুরু করেছে। কেবলমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই ইসলামিক জীবন ব্যবস্থাকে পূনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, কুফর

এবং তাদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের চারিদিকের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আলোতে ফিরিয়ে আনতে পারে।
আজ উম্মাহ্'র মধ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বাসীদের ঠিক সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর মতো আল্লাহ'র আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানদের জন্য বাতিল ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করাকে ফরয করেছেন এবং এ সংগ্রামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতি অনুসরণ করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ যে পদ্ধতিতে কঠোর পরিশ্রম করে আল্লাহর সহায়তায় মদীনাতে ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলমানদেরকেও সেই একই পন্থায় অগ্রসর হতে হবে। আজ মুসলিম উম্মাহর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে এ জুলুম নির্যাতনের পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য ইসলামী জীবনাদর্শ তথা খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করা। এ ব্যবস্থাই মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে পারে। খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা শুধু মুসলমানদেরই জুলুম থেকে রক্ষা করে না বরং সমগ্র পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের জন্য জুলুম-নিপীড়ণবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করে।

মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় খিলাফত ব্যবস্থা আর বেশি দুরে নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা সুরা নুরের ৫৫ নম্বর আয়াতে মুসলমানদেরকে এ সংগ্রামে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন-

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদিগকে দিয়েছিলেন।" (সূরা নূর, আয়াত ৫৫)

মুসলমানদের জানা উচিত যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব এবং একে অবহেলা করা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই মুসলমানদেরকে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এমন কোন কিছুর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন, যা তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে, তখন তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দাও।" [সূরা আনফাল-৮:২৪]

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে আমাদেরকে আশার কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন "পৃথিবীতে আবার নবুয়তের আদলে খিলাফত ব্যবস্থা ফিরে আসবে।" আবু হাজিমের বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আমি আবু হুরায়রা রা. কে বলতে শুনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

অর্থ: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বনী ইসরাইল এর নবীগণ তাদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদেরকে কি নির্দেশ করছেন?
তিনি বললেন তোমরা একের পর এক তাদের বাইআ'তের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করবেন।" (সহীহ বুখারী-৩৪৫৫। মুসলিম ৪৮৭৯)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিরোধানের ঘটনা আমরা সকলে জানি। তাঁর ওফাতের পরে কাকে খলিফা নির্বাচন করা হবে তা হয়ে উঠেছিল যুগশ্রেষ্ঠ সাহাবাদের প্রথম দায়িত্ব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার শেষার্ধে ইন্তেকাল করলেন। সেদিন সমস্ত দিন, এমনকি রাতেও

তাঁকে দাফন করা সম্ভব হলো না। মঙ্গলবার রাতে, আবু বকর (রা.) কে বায়াত দিয়ে খলীফা নিযুক্ত করার পর, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফন কার্য সম্পন্ন করা হল। প্রথমে তারা তাদের নেতা বা খলিফা নির্বাচন করেছেন, তারপর তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লাশ মুবারক দাফন করেছেন। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লাশ মুবারক দাফন করার চেয়েও মুসলমানদের খলিফা নির্বাচন করা ছিল প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং, মৃতব্যক্তিকে দাফন না করে তার পূর্বে খলীফা নিয়োগে ব্যস্ত থাকার এই কাজটি সকল সাহাবাদের (রা.) সম্মিলিত ঐক্যমতের (ইজমা আস-সাহাবা) একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মুসলিমদের উপর একজন খলীফা নিয়োগ করা যদি এমনই বাধ্যতামূলক না হতো এবং মৃতব্যক্তির দাফন কার্য হতে খলীফা নিয়োগের ব্যাপারটি অধিক গুরুত্বপূর্ণই না হতো, তবে সকল সাহাবীরা (রা.) সম্মিলিতভাবে এ বিষয়ে কখনোই ঐক্যমতে পৌঁছাতেন না।
মুসলমানদেরকে আজ এ সত্য উপলব্ধি করে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আজ মুসলিম উম্মাহর সামনে আবারও ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন মদীনার বুকে মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ একটি আদর্শিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সুসংহত করেছিলেন, এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য যেই খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মডেল রেখে গিয়েছেন সেই ব্যবস্থাই আমাদেরকে আবারও ফিরিয়ে আনতে হবে। যত দ্রুত আমরা সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবো, যত শীঘ্র আমরা নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, পথহারা মুসলিম উম্মাহকে তার সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবো এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবো; তত শীঘ্রই মহান আল্লাহর নুসরাত ও বিজয়ের ওয়াদাও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সঠিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

ওয়া আখিরু দাওয়া না আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিল মুরছালীনা ওয়া খাতামীন নাবীয়্যীন ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আযওয়াজিহী আজমাঈন।